পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

উপকূলীয় অঞ্চলের মহিষ কথা

একটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা

উপকূলীয় অঞ্চলের

মহিষ কথা

একটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা

উপকূলীয় অঞ্চলের

মহিষ কথা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

EMBASSY OF DENMARK

GJUS

উপকূলীয় অঞ্চলের

মহিষ কথা

গবেষক ও লেখক

মো: মজনু সরকার, পিকেএসএফ
হোসাইন মোহাম্মদ জাকি

উপদেশনা

মো: ফজলুল কাদের, পিকেএসএফ

পরামর্শক

ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, পিকেএসএফ

সার্বিক সহযোগিতায়

জাকির হোসেন মহিন, জিজেইউএস
ডা: মো: খলিলুর রহমান, জিজেইউএস

শিল্প নির্দেশক

আশিকুল ইসলাম মিটু

আলোকচিত্র

মো: ফয়জুল তারিক চৌধুরী, পিকেএসএফ
মো: রাসেল উদ্দিন, জিজেইউএস

প্রকাশক

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), ভোলা

অর্থায়ন

RMTP, পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডা

ভাবনা, গ্রন্থ নকশা, অলঙ্করণ ও মুদ্রণ

ছায়াকর কমিউনিকেশন

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৩

সাহিত্য ও সঙ্গীতে সেকালের মহিষ

‘নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো’ প্রবাদটি দেখেই বোঝা যায় পালিত মহিষের পাশাপাশি বুনো মহিষেরও আশ্রয়স্থল ছিল সেকালের এই জনপদ। এম এ হামিদের লেখা ‘চলন বিলের ইতিকথা’ গ্রন্থে (১৯৬৭) জঙ্গলা মহিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘পূর্বে চলনবিলে প্রচুর ঘাস জন্মিত। ঘাসের লোভে জলপাইগুড়ির পাহাড় হইতে বহু সংখ্যক জঙ্গলা মহিষ গ্রীষ্মকালে চলনবিলে নামিয়া আসিত। ...চলনবিলের মহিষমারী, মহিষাগাড়ী, মহিষা হালট, মহিষ বাথান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলা মহিষের আস্তানা ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং মানুষ দেখিলে তাহাকে তাড়া করিয়া মারিয়া ফেলিত; উপরন্তু, লোকের বহু আবাদ বিনষ্ট করিত।’

হিংস্র বুনো মহিষের একটি অনুপুঙ্খ চিত্র ফুটে ওঠেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ গ্রন্থে ‘মহিষ দেখিয়া মনে হইল এ ধরনের মহিষ আর কখনো দেখি নাই। প্রকান্ড একজোড়া শিং, গায়ে লম্বা লোম-বিপুল শরীর। কাছেও কোনো লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই-তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোথাওবা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি মুনেশ্বর সিং চাকলাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল-আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! ...ও পোষা ভঁইশ নয়, ও হোলো আড়ন, বুনো ভঁইস হুজুর, মোহনপুর জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো। জলকষ্টে পড়ে এসেছে। ...বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।’

বন্য মহিষের হামলা থেকে রক্ষা পেত না বাঘও! মহিষের হামলায় একবার বাঘের কিরূপ দুর্দশা ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। ‘সুন্দরবনে সাত বৎসর’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘আর একদিন একটা বাঘ ভারি জব্দ হইয়াছিল। তাহার যে দুর্দশা হইয়াছিল, বলি শুন। বাঘ সুন্দরবনের বলিলেই হয়, কিন্তু সুন্দরবনের মহিষগুলিও বড়ো ভয়ংকর, অত বড়ো ও বলবান মহিষ অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঘে-মহিষে সুন্দরবনে প্রায়ই লড়াই হয়। কখনো বাঘের জিৎ হয়, কখনও বা মহিষকে জিতিতে দেখা গিয়া থাকে। সে

যাহাই হউক, একদিন একটা মহিষের বাচ্চা চরিতে চরিতে বাথান হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। একটা বাঘ বেচারাকে দেখিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া, যেমন তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দিতে যাইবে, এমন সময় বাচ্চাটি তাহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে ছয় সাতটা মহিষ সেইদিকে দৌড়িয়া আসিল। বাঘ তখন আর পালাইবার অবসরটুকুও পাইল না। সেই ছয়-সাতটা মহিষে মিলিয়া শিং এবং পায়ের আঘাতে বাঘটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলিল।'

সেকালে নীলকর সাহেবদের ষাঁড়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহিষের চমৎকার ব্যবহারের কথাও জানা যায়। ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে এম এ হামিদের 'চলন বিলের ইতিকথা' গ্রন্থে (১৯৬৭)। গ্রন্থটি পড়ে জানা যায়, দয়ারামপুরের চড়পাড়ায় কিনু সরকার নামে একজন স্বচ্ছল কৃষক ছিলেন। তাঁর পালে শুধু মহিষই ছিল সাড়ে তিনশ। পাশেই সালিখা গ্রামে ছিল নীলকর সাহেবদের কুঠি। তাদের ষাঁড়ের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করার কারো সাহস ছিল না। তারা কিনু সরকারের শরণাপন্ন হলো। কিনু সরকার তাঁর পালের বাছাই করা দুষ্ট প্রকৃতির কতগুলো মহিষ নিয়ে নীল কুঠির সাহেবদের ষাঁড়ের পেছনে লেলিয়ে দেন। মহিষের লম্বা ধারালো শৃঙ্গের আঘাতে ষাঁড়গুলি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পলায়ন করে। তখন থেকে সাহেবরা ষাঁড় বেঁধে রাখতে শিখে! মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর লেখা যুগবিচিত্রা (১৯৬৭) থেকেও মহিষের লড়াই সম্পর্কে জানা যায়। তিনি লিখেছেন, সন্দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ ছিল শীত ঋতুতে মহিষ ও বৃষের লড়াই। মহিষ পালন দ্বারা সেকালে যারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাদেরকে বলা হতো 'মৈষাল'। মৈষাল জীবনের সুখ দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে। 'ধীকো ধীকো ধীকো মৈষাল রে/আরে ও মৈষাল ধীকো তোমার হিয়া/কোন পরাণে যাইবেন মৈষাল/আমাকে ছাড়িয়া মৈষাল রে।' এইভাবে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে সেকালে এই জনপদে বিচরণরত মহিষের বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

বৃটিশ আমলের মহিষ

বন্য মহিষের কথা ফুরাল। এবার আসা যাক, বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে পালিত মহিষে। দুধ ও মাংস উৎপাদন এবং ভারবহন – এই তিন কাজের কাজী নামে পরিচিত পালিত মহিষ। গো অথবা মহিষ শকট'ই ছিল সেকালের একমাত্র যান। মহিষের গাড়ি ছাড়া অন্য কোন প্রকার যানবাহনের উপযোগী ছিলনা তৎকালীন রাস্তাঘাট। বিশেষতঃ চলন বিল অঞ্চল ছিল দুর্গম পথ। গাড়ী চলাতো দূরের কথা, পায়ে হাঁটাই ছিল খুব কষ্টকর। এই দুর্গম পথের একমাত্র বাহন ছিল মহিষের গাড়ী। তখন প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ীতেই থাকতো ২-১ জোড়া মহিষ। দু-বেলা নিয়ম করে মহিষের দুধ দিয়ে ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা যদিও এখন বিশ্বাস করা সুকঠিন। জমিতে হালচাষ করার পর মহিষ দিয়ে ক্ষেতে মই দেওয়া হতো। শুস্ক মৌসুমে বিল অঞ্চলের বধুরা নাইয়োরিতে যেতো মহিষ অথবা গরুর গাড়ীতে। দুধ উৎপাদনে গরুর পরেই ছিল মহিষের স্থান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'আত্মচরিত' গ্রন্থে সেকালের দুধ দোহনকারী গোয়ালাদের সম্পর্কে জানা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার বাল্যকালে, কলিকাতার গোয়ালারা সব বাঙালী ছিল। কিন্তু এখন আর ঐ ব্যবসায়ে বাঙালী দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা বাঙালীদের ঐ ব্যবসা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা ভাল জাতের গরু ও মহিষ রাখে, তাহাদের পুষ্টিকর ভাল খাদ্য খাওয়ায়। সুতরাং বাঙালী গোয়ালাদের গরুর চেয়ে তাহাদের গরু বেশী দুধ দেয়।' গো-মহিষের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এবং গোসম্পদের অবনতির কারণ সম্পর্কিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দী (১৯০০-১৯৪৭)' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, '১৯২০ সালে পূর্ববঙ্গে গো-মহিষের সংখ্যা ছিল ১,৮৩,৫১,০০০ এবং লাঙ্গলের সংখ্যা ৪৪,৫৮,০০০। ১৯৪৫ সালে পশুর সংখ্যা ছিল ১,৭০,৯৭,০০০ এবং লাঙ্গলের সংখ্যা ৪৩,৫০,০০০। দেখা যায় পঁচিশ বছরে গো-মহিষ ও লাঙ্গল উভয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ...বলাবাহুল্য, বাংলার কৃষি অনেকখানি নির্ভরশীল তার গোসম্পদের উপর, অথচ এর উন্নতিতে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। ...স্বীকার করতেই হয় বাংলার গোসম্পদ খুবই নিম্নমানের। বাংলার গরু-মহিষ দুর্বল এবং গাভী অল্প দুধ দেয়। বাংলার গোসম্পদের অবনতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বহুকালের অবহেলায় এদেশের গরু-মহিষ খর্বাকৃতি, অপুষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ভাল জাত প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ভাল ষাঁড় বাংলায় খুব দুর্লভ, সেজন্য বলিষ্ঠ প্রজাতি সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়নি। গোসম্পদের অবনতির দ্বিতীয় কারণ হলো এদেশের কৃষি অর্থনীতিতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোচারণভূমি চাষের আওতায় আনা হয়।' ১৯৪১ সালের ১৬ জুন প্রকাশিত 'আর্থিক জগত' নামক সাময়িকীতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়, 'বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৬।।০ কোটীর উপর দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ রহিয়াছে এবং উহারা বৎসরে প্রায় ৬২ কোটি মণ দুধ দিয়া থাকে। গড়পরতায় ৩ টাকা করিয়া মূল্য ধরিলে উহার মূল্য দাঁড়ায় বৎসরে ১৮০ কোটি টাকার উপর। দেশের অধিবাসিগণ এই দুগ্ধের শতকরা ২৭ ভাগ মাত্র দুগ্ধ হিসাবে ব্যবহার করে এবং ৭৩ ভাগ ঘৃত, ঘোল, দধি, ছানা, মাখন ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত জিনিস এই উভয়ে মিলিয়া এদেশের অধিবাসিগণ যে পরিমাণ দুগ্ধ ব্যবহার করে তাহাতে গড়পরতায় প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিদিনে ব্যবহৃত দুগ্ধের পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ৬ আউন্স, অর্থাৎ ৩ ছটাকের কাছাকাছি। অথচ এই সময় বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগণও গড়পরতায় প্রত্যহ ২ সেরের মত দুগ্ধ খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে দুগ্ধের এই অভাবের প্রধান কারণ হইতেছে গোপালন ও গরুর খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ভারতের গো মহিষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুধের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র লইয়া সমগ্র ইউরোপে যত দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ রহিয়াছে ভারতবর্ষেও ততো সংখ্যক গাভী ও মহিষ আছে। কিন্তু ইউরোপে বৎসরে যত দুগ্ধ উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়। কানাডার তুলনায় ভারতবর্ষে ১৭ গুণ বেশি দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ আছে। কিন্তু এদেশে কানাডার তুলনায় মাত্র ৪ গুণ বেশি দুগ্ধ পাওয়া যায়। জার্ম্মাণীতে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা ভারতবর্ষের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। কিন্তু ঐ

দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশি দুগ্ধ উৎপন্ন হয়।...' একই সাময়িকীতে ১৯৪১ সালের ১৪ জুলাই প্রকাশিত কলকাতার বাজার দর বিশ্লেষণে দেখা যায়, দিনে ১২ সের দুধ দেয় এরূপ প্রতিটি মহিষ ১৮০৲ (টাকা) এবং দিনে ১০ সের দুধ দেয় এরূপ প্রতিটি মহিষের মূল্য ১৪৫৲ (টাকা) ছিল।

ভারতীয় মহিষের ইতিহাস স্টাডি করে জানা যায়, গৃহপালিত জল মহিষের সম্ভবত পূর্বপুরুষ হল বন্য জল মহিষ, যা ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্ভবত পশ্চিম ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল এবং প্রায় ৬৩০০ বছর আগে গৃহপালিত হয়েছিল, যেখানে জলাভূমির ধরনটি মেইনল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং প্রায় ৩০০০ থেকে ৭০০০ বছর আগে গৃহপালিত হয়েছিল। এরপর নদী মহিষ পশ্চিমে মিশর, বলকান এবং ইতালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং সোয়াম্প মহিষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাকি অংশে এবং ইয়াংজি নদী উপত্যকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ের ভারতীয় নদীমহিষ হল জটিল গৃহপালন প্রক্রিয়ার

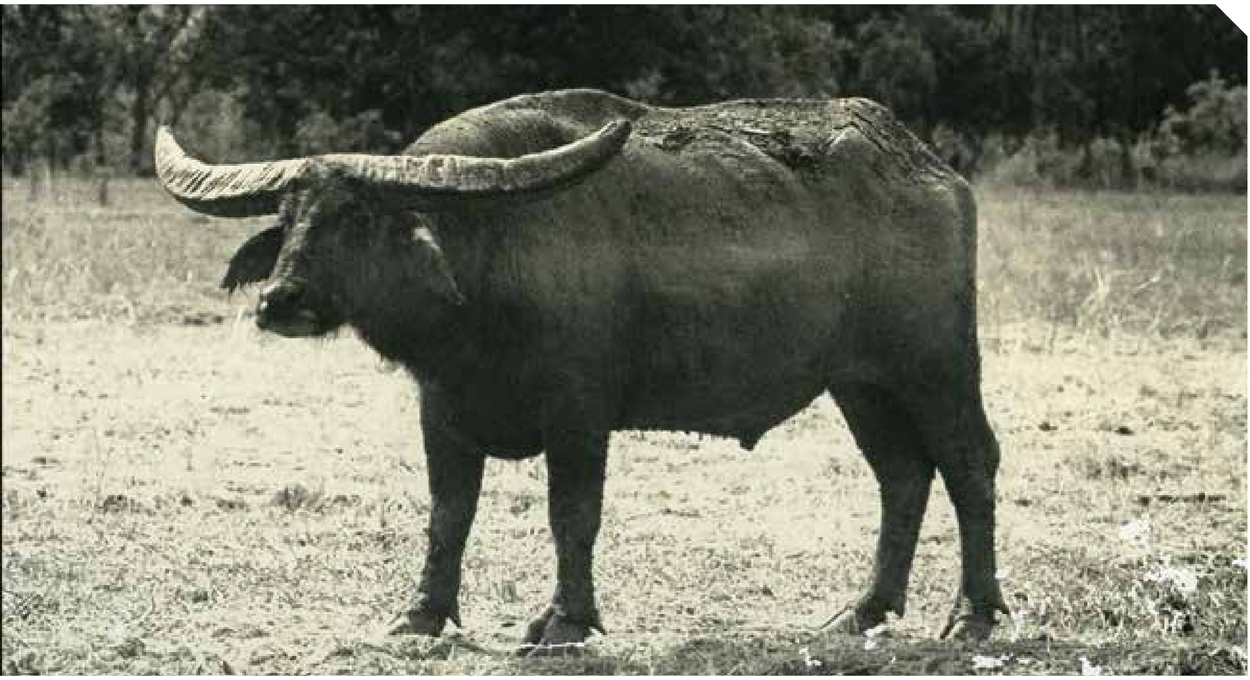

উৎসঃ ইন্টারনেট

স্থানীয়। রূপগত এবং আচরণগত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের গৃহপালিত জলমহিষ স্বীকৃত, যথা- নদীমহিষ এবং সোয়াম্পমহিষ। নদী এবং জলাভূমির ধরনের জলমহিষগুলি স্বাধীনভাবে গৃহপালিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। একটি ফাইলোজেনেটিক গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে নদী ধরনের জলমহিষ ফলাফল, যার মধ্যে একাধিক মাতৃবংশ এবং প্রাথমিক গৃহপালিত ঘটনার পর বন্য জনগোষ্ঠী থেকে উল্লেখযোগ্য মাতৃজিন প্রবাহ। নদীমহিষের ২২ টি জাত পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে মুররাহ, নিলিরাভি, সুরতি, কারাবাও, আনাতোলিয়ান, ভূমধ্যসাগরীয় এবং মিশরীয় মহিষ।

পাকিস্তান আমল

'৪৭ পরবর্তী সময়ে প্রাণিসম্পদ খাতে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন আসে। ১৯৬০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'Notes on the agricultural economies of the far east' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে মহিষের সংখ্যা ছিল ০.৬০ মিলিয়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মহিষের সংখ্যা ছিল ৫.০০ মিলিয়ন। সেসময় মহিষ দিয়ে আখ যাঁতাকলে মাড়িয়ে রস বের করে বিভিন্ন স্বাদের পিঠাসহ নানা রকম খাদ্য উপকরণ তৈরি করা হতো। আখ মাড়াইয়ের জন্য এসময় মহিষের চোখে কাপড় বেঁধে দেয়া হতো। কৃষিক্ষেত্রে অত্যাধুনিক মেশিনের আবির্ভাব তখনো খুব একটা শুরু হয়নি। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হামিদুর রহমানের লেখা 'আমাদের পশুপক্ষী'তে মহিষ সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'পাকিস্তানের মহিষ' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব উন্নত বংশজাত মহিষ নাই। দেশি মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য এ সময় পূর্ব পাকিস্থানের সরকারী ডেইরী ফার্মগুলিতে পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে বেশ কতকগুলি উন্নত জাতের মহিষ আনা হইয়াছে। হালচাষ ও গাড়ী টানার জন্য এ সময় উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং খুলনা ও বরিশাল জেলার চর অঞ্চলে কিছু মহিষ দেখা যায়।'

হামিদুর রহমানের লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন স্টাডি থেকে জানা যায়, মুলত এই সময় অর্থাৎ ১৯৬০ সালে দেশ ভাগের পূর্বে সরকারিভাবে পাকিস্থান থেকে নিলিরাভি নামক ভালো জাতের কিছু ষাড় মহিষ এনে এ জনপদের দেশি মহিষের সাথে ক্রস করানোর মাধ্যমে দেশে প্রথম মহিষের জাত উন্নয়নের সূচনা হয়।

উৎসঃ ইন্টারনেট

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মহিষ খাত ও বৈশ্বিক অবস্থান

আনুমানিক ৫০০০ বছর আগে এশিয়াতে সর্বপ্রথম মহিষ পালন শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে এশিয়ার সকল দেশে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)'র তথ্য মোতাবেক, ১৯৭৬-১৯৮৬ সময়কালে বাংলাদেশের মহিষ খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়। এ সময়ে মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৫৮.৭০ ভাগ। পরবর্তী দশকগুলোতে আমাদের দেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে চারণভূমি কমে যাওয়ায় মহিষ পালন সেভাবে বিকশিত হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে মহিষ রয়েছে মাত্র ১.৫ মিলিয়ন, যা বিশ্বের মোট মহিষের মাত্র ০.৭৭ ভাগ। পৃথিবীতে বর্তমানে ১৯৪.২৯ মিলিয়ন মহিষ রয়েছে। যার মধ্যে ৯২.৫২ শতাংশ (১৭৯.৭৫ মিলিয়ন) রয়েছে এশিয়াতে। এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ভারত হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মহিষ উৎপাদনকারী দেশ। যেখানে বিশ্বের মোট ৫৮.১১ শতাংশ (১১২.৯১ মিলিয়ন) মহিষ রয়েছে। ভারতের পরই পাকিস্তানের অবস্থান, যেখানে বিশ্বের মোট মহিষের ১৬.৮৩ ভাগ (৩২.৭০ মিলিয়ন) রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মোট ৭২টি মহিষের জাত রয়েছে। তন্মধ্যে ৫৭টির অবস্থান এশিয়ায়। এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ভারতেই রয়েছে ২০টি মহিষের জাত। এর মধ্যে মুররাহ এবং নিলিরাভী সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বাংলাদেশের মহিষকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- ১) উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া দেশি মহিষ এবং ভারত ও মায়ানমার থেকে আসা অভিবাসী মহিষ (সাদুল্লাহ, ২০১২)। ভারত থেকে আসা অভিবাসী মহিষগুলো সাধারণত নদী টাইপের মহিষ এবং মায়ানমার থেকে থেকে মহিষগুলো সোয়াম্প টাইপের (ফারুক, ১৯৯০)। ফারুক এট অল. ১৯৯০ এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মহিষ পাওয়া গেলেও জল মহিষের স্বীকৃত কোন জাত নেই এবং বাংলাদেশের মহিষ প্রধানত দেশীয় অ-বর্ণনামূলক টাইপের (indigenous non-descriptive type)। বাংলাদেশে সাধারণত নদী ও জলা মহিষ উভয় ধরনের মহিষ পাওয়া যায়, তবে নদী মহিষের আধিক্য বেশি, যা মুলত দুধ উৎপাদনের জন্য পালিত হয় (সারওয়ার এট অল. ২০০২)। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে মহিষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলোতে মহিষের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

FAO (১৯৮৬) এর তথ্যানুযায়ী — মহিষের পরিমাণ (হাজারে)

FAO (২০১৭) এর তথ্যানুযায়ী — মহিষের পরিমাণ (হাজারে)

দেশের নাম	১৯৭৬ সাল	১৯৮৬ সাল	২০১৭ সাল
বিশ্ব	১৩১৯০৬	১৩৮৩৫২	২০১০০০
এশিয়া	১২৮৫১২	১৩৪১৯৯	১৯৪৯১৪
ভারত	৬১০৮৭	৭৫০১০	১১৩৩৩০
বাংলাদেশ	৭১৯	১৮৬০	১৪৭৮
চীন	৩০১২১	২০০৩৮	২৩৪৬৯
নেপাল	৩৯৩০	২৮৯০	৫১৭৮
পাকিস্তান	১০৭৯৫	১৩৩৮৪	৩৭৭০০
শ্রীলংকা	৮৫৪	৯৬৪	২৮৪

জাত পরিচিতি
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

সমগ্র বিশ্বে প্রধানত দুই ধরনের ওয়াইল্ড বাফেলো বা বন্য মহিষ রয়েছে, যথা- এশিয়াটিক মহিষ (Bos arnee) এবং আফ্রিকান মহিষ (Syncerus caffer)। বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটা সাধারণতভাবে স্বীকৃত যে, গৃহপালিত ওয়াটার বাফেলো বা জল মহিষ (Bubalus bubalis), এশিয়াটিক মহিষ (Bos arnee) থেকে উদ্ভুত যার আবাসস্থল ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল । মহিষ দুটি উপ-প্রজাতিতে অন্তর্ভুক্ত, যথা- রিভার টাইপ বা নদীর ধরন (Bubalus bubalis bubalis; 2n = 50) এবং সোয়াম্প টাইপ বা জলাভূমির ধরন (Bubalus bubalis carabensis; 2n = 48) -এর মহিষ, যা প্রায় ৫,০০০ বছর পূর্বে এই অঞ্চলে গৃহপালিত হয়েছে (ফাহিমুদ্দিন, ১৯৭৫; তথ্যানুযায়ী)। বিভিন্ন স্টাডি থেকে জানা যায়, এই নদী ও সোয়াম্প মহিষের বিশ্বব্যাপি ৭০ টি স্বীকৃত জাত রয়েছে, এর মধ্যে ৫৭ টি জাতের অবস্থান এশিয়াতে। নদী মহিষের ১৬ টি জাত রয়েছে, এর মধ্যে শুধু ভারতেই আছে ১৩ টি, পাকিস্থানে ২ টি ও ইতালিতে ১ টি। ভারতের মহিষের স্বীকৃত ১৩ টি জাত হলো- মুররাহ, বন্নি, জাফরাবাদি, সুরতি, মেহসেনা, নাগপুরি, ভাদওয়ারী, চিলিকা, পানধরপুরী, টোডা, কালাহান্ডী, মারাথাডি ও নিলিরাভী। পাকিস্থানের জাতগুলো হলো- নিলিরাভী ও কুন্ধী এবং ইতালির মহিষের স্বীকৃত জাত হলো-ইতালীয় মেডিটেরিয়ান মহিষ। এই সব জাতের মধ্যে দুধের জন্য মুররাহ, বন্নি, জাফরাবাদি, সুরতি, নিলিরাভী ও ইতালীয় মেডিটেরিয়ান মহিষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসর মোঃ ওমর ফারুক ও মোঃ শাহেদ হোসেন (২০২৩)-এর মহিষের বিভিন্ন জাত বিষয়ক লেখা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে মহিষের কোন স্বীকৃত জাত নেই। তবে দুই ধরনের মহিষ আছে, যেমন-জলাভূমির মহিষ ও নদীর মহিষ। যার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

জলাভূমির মহিষ

দেশে জলাভূমির মহিষ শুধু সিলেট বিভাগের জেলাসমূহে পাওয়া যায়, যা দেশের মোট মহিষের ১৪% । এদের গায়ের রং ধূসর, শিং অর্ধচন্দ্রাকৃতির, গলার নীচে ও দেহকম্বলে সাদা দাগ (chevron) আছে এবং হাঁটু থেকে ক্ষুরের ওপর পর্যন্ত পায়ের রং সাদা। বয়স্ক মহিষের ওজন সাধারণত ৩০০-৩৫০ কেজি হয়ে থাকে। এসব মহিষের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। শুধুমাত্র সিলেট বিভাগের জেলাগুলোতে এই মহিষ বর্তমানে মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

নদীর মহিষ

সিলেট বিভাগের জেলাসমূহ বাদ দিয়ে দেশের অন্যান্য বিভাগে এই মহিষ পাওয়া যায়, যা দেশের মোট মহিষের ৮৬% । উৎপত্তি অনুসারে এসব মহিষকে ৪ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: ১) আদি নদীর মহিষ, ২) দেশি নদীর মহিষ, ৩) ভারত থেকে আমদানীকৃত উন্নত নদীর মহিষ এবং ৪) শংকর জাতের নদীর মহিষ।

১. **আদি নদীর মহিষ:** বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহে এসব মহিষ পাওয়া যায়। এসব মহিষ দেখতে জলাভূমির মহিষের ন্যায়, তবে এদের শিং জলাভূমির মহিষের তুলনায় সরু এবং শিং এর গোড়ার প্রশস্ততা জলাভূমির মহিষের শিং এর গোড়ার প্রশস্ততার চেয়ে কম। বয়স্ক মহিষের ওজন সাধারণত ২৫০-৩০০ কেজি হয়ে থাকে। এদের দুধ উৎপাদন খুবই কম। এরা সাধারণত ২৭৪ দিনে মাত্র ৩০০-৩৫০ কেজি দুধ উৎপাদন করে থাকে।

২. **দেশি নদীর মহিষ:** ভারত থেকে বিভিন্ন সময় বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত মহিষের মধ্যে সমাগম ও বাছাই এর মাধ্যমে দুধাল জাতের এ মহিষসমূহের সৃষ্টি। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর চরাঞ্চলে অর্ধমুক্ত ব্যবস্থাপনায় এ সকল মহিষ পালন করা হয়। এদের গায়ের রং কাল, শিং এর নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। বয়স্ক মহিষের ওজন সাধারণত ৩০০-৩৫০ কেজি হয়ে থাকে। দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০দিনে মাত্র ৫০০-৫৫০ কেজি।

৩. **ভারত থেকে আমদানীকৃত উন্নত নদীর মহিষ:** ভারত থেকে বিভিন্ন সময় বেসরকারিভাবে আমদানির মাধ্যমে এ মহিষ দলের সৃষ্টি। এসব মহিষ ভারতের মহিষের স্বীকৃত জাতসমূহের শংকর। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর চরাঞ্চলে অর্ধমুক্ত বা মুক্ত ব্যবস্থাপনায় এ সকল মহিষ পালন করা হয়। এদের গায়ের রং কাল, শিং এর নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই, কিছু মহিষের লেজের চুল ও হাঁটুর নিচের অংশ সাদা হয়। বয়স্ক মহিষের ওজন সাধারণত ৩০০-৫০০ কেজি হয়ে থাকে। দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ দিনে মাত্র ৭৫০-৮৫০ কেজি।

৪. **শংকর জাতের নদীর মহিষ:** বাংলাদেশের অঞ্চলের দ্বীপসমূহে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার দ্বীপসমূহে ১৯৬০ থেকে নিলিরাভী জাতের মহিষের সঙ্গে আদি নদীর মহিষের প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে শংকর জাতের এ মহিষের সৃষ্টি। এসব মহিষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বহুরুপতা দেখা যায়। এসব মহিষ দুধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এরা সাধারণত ২৭০ দিনে ৫০০-৭০০ কেজি দুধ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া ইটালিয়ান মেডিটেরিয়ান মহিষ ও মুররাহ মহিষের বীজ দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে শংকর জাতের এ মহিষের সৃষ্টি।

মহিষের মাংস ও দুধের উৎপাদন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর তথ্যানুসারে ২০১৯ সালে বিশ্বে মোট মহিষের মাংস উৎপাদিত হয়েছে ৪.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। তন্মধ্যে এককভাবে ভারতে উৎপাদিত হয়েছে ১.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন (মোট উৎপাদনের ৩৮.০৯%) এবং পাকিস্তানের উৎপাদিত হয়েছে ১.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন (২৬.১৯%)। যেখানে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ৬৯৬৬ মেট্রিক টন (০.১৬%)। একই সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০২০ সালে সারা বিশ্বে মোট দুধ উৎপাদন হয়েছে ৪,৮২,০১৪ হাজার টন, যার ৮১% গরু, ১৫% মহিষ এবং অবশিষ্ট ৪% ছাগল, ভেড়া এবং উট থেকে এসেছে। বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দুধ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল এবং ভারতের নাম থাকলেও বিশ্বের মোট দুধ উৎপাদনের ৪০.৪১% আসে শুধু ভারত থেকেই (প্রায় ১৯৪,৮০০ হাজার টন)। আর ভারতের মোট দুধ উৎপাদনের প্রায় ৫০% আসে ১১২.৯১মিলিয়ন মহিষ থেকে, যেখানে বিশ্বে মোট ১৯৪.২৯ মিলিয়ন মহিষ থেকে মোট দুধ উৎপাদন হয় ৭২,৩০২হাজার টন। বিশ্বের মোট মহিষের দুধ উৎপাদনের ৯৩.১৯% উৎপাদিত হয় সার্কভুক্ত দেশগুলোতে। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে মহিষের দুধ উৎপাদনে ভারতের কন্ট্রিবিউশন ৬৮.৭৮% (বিশ্বের প্রথম) এবং পাকিস্থানের কন্ট্রিবিউশন ২৫.৭০% (বিশ্বের দ্বিতীয়)। মহিষের দুধ উৎপাদনে শীর্ষ ২০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। বর্তমানে দেশে মহিষ থেকে মোট বাৎসরিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ৩৫,৯৮৩ মেট্রিক টন, যা বিশ্বের মোট দুধ উৎপাদনের মাত্র ০.০৩% এবং দেশজ দুধ উৎপাদনের ০.৩৩% (faostat.org- 2019)। FAO-এর হিসাব মোতাবেক, একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের প্রতিদিন ন্যূনতম ২৫০ মিলি দুধ ও ১২০ গ্রাম মাংস খাওয়া প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২২ সালের তথ্য মোতাবেক বর্তমানে দেশজ উৎপাদিত চাহিদা অনুযায়ী দুধ ও মাংসের সরবরাহ যথাক্রমে ২০৮.৬১ মিলি এবং ১৪৭.৮৪ গ্রাম। এ তথ্যানুযায়ী দুধ উৎপাদনে আমাদের প্রায় ১৬.৫৬% ঘাটতি রয়েছে।

মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও ভক্ষণের দিক দিয়ে আমরা এখনো বেশ পিছিয়ে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মতে, মানবদেহের সুস্থতার জন্য প্রতি বছর মাথাপিছু কমপক্ষে ৪৮ কেজি মাংস খাওয়া প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে দেশে জনপ্রতি গড়ে ৪-৪.৫ কেজি মাংস খাচ্ছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে দেশে হিমায়িত মহিষের মাংস আমদানি হয়েছে তিন লাখ ৩৬ হাজার কেজি। মে মাসে ছিল তিন লাখ ৭৪ হাজার কেজি, জুন মাসে ছয় লাখ তিন হাজার কেজি, জুলাই মাসে পাঁচ লাখ ৪৭ হাজার কেজি ও আগস্ট মাসে তিন লাখ ৯১ হাজার কেজি। পাঁচ মাসে মহিষের মাংস আমদানি হয়েছে প্রায় ২২ লাখ ৫২ হাজার কেজি (১১ অক্টোবর ২০১৯, কালের কণ্ঠ)। আমদানীর এই তথ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, মহিষের মাংস উৎপাদনে আমরা কতটা পিছিয়ে।

এছাড়া মহিষের দুধ থেকে বৈচিত্র্যময় দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক পিছিয়ে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিষের দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাতীয় পণ্য যেমন- বিভিন্ন ধরণের চিজ, পনির, বাটার, বাটার ওয়েল, ঘি, আইসক্রিম, কনডেন্স মিল্ক, পাউডার মিল্ক, বাটার মিল্ক, পাস্তরিত মিল্ক, ফার্মেন্টেড মিল্ক প্রোডাক্ট, 'কার্ড বা ইয়োগার্ট', খোয়া ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে মহিষের দুধ থেকে তৈরি পণ্যের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি। এর মধ্যে প্রধানত দধি তৈরি হয়ে থাকে। অন্যদিকে মহিষের মাংস থেকে তৈরি বৈচিত্র্যময় মাংসজাতীয় পণ্য আমাদের দেশে নেই শুধু মাত্র ফ্রেশ মাংস হিসেবে বিক্রি হয়ে থাকে। অথচ ভারতসহ অনেক দেশে মহিষের মাংস থেকে তৈরি মিট সসেজ, মিট লফস, মিট বার্গার, মিট প্যাটিস, কর্নড বাফেলো মিট, কিউর বাফেলো মিট, ফ্রোজেন বাফেলো মিট বেশ জনপ্রিয়।

পুষ্টি বিচারে মহিষের মাংস ও দুধ

মহিষের মাংসের পুষ্টিগুণ

পুষ্টি বিচারে মহিষের মাংস গরুর মাংসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো। মহিষের মাংস খুবই কোমল, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর লাল মাংস বলে গরুর মাংসের বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী এই মাংসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মাংস দ্রুত রান্না হয়, সহজে হজমযোগ্য এবং কোন অ্যালার্জেনিক প্রভাব নেই। এই মাংসের কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি প্রোফাইলের উপর উপকারী প্রভাব রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই মাংস গরুর মাংসের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে উন্নতমানের। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, গরুর মাংসের তুলনায় মহিষের মাংসে ৪০% কম কোলেস্টেরল থাকে, ১২% কম চর্বি থাকে, ৫৫% কম ক্যালোরি থাকে, ১১% বেশি প্রোটিন থাকে এবং ১০% বেশি খনিজ থাকে (এম. এ হামিদ এট.অল.-২০১৬)। কিছু গবেষণায় দেখা যায়- প্রতি ১০০ গ্রাম মহিষের মাংসে মাত্র ৩৫ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে, যেখানে গরুর মাংসে কোলেস্টেরল থাকে ৮০ মিলিগ্রাম। এমনকি মুরগির মাংসেও মহিষের মাংসের চেয়ে বেশি কোলেস্টেরল থাকে (৮০ মিলিগ্রাম)। মহিষের মাংসে, গরুর চেয়ে (গরুর মাংসে চর্বি থাকে ১৫-২০%) অনেক কম পরিমানে চর্বি থাকে (মাত্র ২%)। প্রোটিনের ক্ষেত্রে মহিষের মাংসে ২৪ শতাংশ থাকে, যা গরুর মাংসের চেয়ে বেশি (গরুর মাংসে থাকে ২২ শতাংশ)। মহিষের মাংসে ৩.৪২ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, যা গরুর মাংসের (২.৭২ মিলিগ্রাম) তুলনায় অনেক বেশি। যা গর্ভবতী মায়েদের দেহে আয়রনের ঘাটতি মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মহিষের মাংসে ২.৮৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১২ থাকে, যা গরুর মাংসের (২.৫০ মিলিগ্রাম) তুলনায় বেশি। যা শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া মহিষের মাংসে মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী উচ্চমাত্রার ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ এর ভালো সমন্বয় পলিআনস্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট রয়েছে, যা রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে আনে। ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং অন্যান্য প্রদাহজনিত রোগের ঝুঁকি কমে।

পুষ্টি নির্দেশকসমূহ (প্রতি ১০০ গ্রামে)	গরুর দুধ	মহিষের দুধ
পানি (গ্রাম)	৮৭.৮	৮১.১
আমিষ/প্রোটিন (গ্রাম)	৩.২	৪.৫
চর্বি/ফ্যাট (গ্রাম)	৩.৯	৮.০
শর্করা/কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	৪.৮	৪.৯
শক্তি/এর্নাজি (কিলো-ক্যালরি)	৬৬	১১০
সুগার/ ল্যাকটোজ (গ্রাম)	৪.৮	৪.৯
স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডস (গ্রাম)	২.৪	৪.২
কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম)	১৪	৮.০
ক্যালসিয়াম (আইইউ)	১২০	১৯৫
ফসফরাস (মিলিগ্রাম)	৯০	১৩০
আয়রণ (মিলিগ্রাম)	০.২	০.২

উৎস: FAOSTAT, 2012

মহিষের দুধের পুষ্টিগুণ

মহিষ থেকে উৎপাদিত দুধ পুষ্টির বিচারে এবং দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে অনেক ক্ষেত্রে গরুর দুধের চেয়ে ভালো। এই দুধে মোট শুস্ক পর্দাথ, চর্বি, ল্যাকটোজ এবং আমিষের পরিমাণ গরুর দুধের চেয়ে বেশি থাকে। বিএলআরআই কর্তৃক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে মহিষের দুধে গড়ে ৬.৪% চর্বি, ৩.৯% আমিষ, ৫.৫% ল্যাকটোজ এবং ১০% চর্বিবিহীন শুস্ক পদার্থ থাকে। এছাড়া মহিষের দুধে গরুর দুধের চেয়ে কোলেস্টেরল, টোকোফেরল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম অনেক কম থাকে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড এবং ফ্যাটি এসিডসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এছাড়াও মহিষের দুধে মানুষের হাড় গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যেমন: ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এমনকি মহিষের দুধ থেকে উৎপাদিত পণ্য যেমন- মাখন, দই, ঘি ও পনিরে গরুর দুধের তৈরি এ সব পণ্য থেকে যথাক্রমে ৩২.২%, ৩৪.৭০%, ২০.২% এবং ৩৪.৭০% কম কোলেস্টেরল থাকে বলে মহিষের দুধ থেকে উৎপাদিত পণ্যগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। Dhanda O.P. নামক একজন ভারতীয় গবেষকের ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'Development of Indian Buffalo as Dairy Animal Proc.' নিবন্ধ থেকে প্রাপ্ত, গরুর দুধ ও মহিষের দুধের পুষ্টিগুণের তুলনামূলক চিত্র উপরের সারণিতে দেয়া হলো। মহিষের দুধে বেশি ফ্যাট থাকে বলে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য বিশেষ করে বাটার, বাটার ওয়েল, চিজ, কনডেন্স মিল্ক, আইস ক্রিম এবং বাটার মিল্ক তৈরিতে গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধের ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সাধারণত ১ কেজি চিজ এবং ১ কেজি বাটার তৈরিতে যেখানে ৮ লিটার গরুর দুধ প্রয়োজন হয় সেখানে মহিষের দুধ প্রয়োজন হয় যথাক্রমে মাত্র ৫ লিটার এবং ১০ লিটার।

পুষ্টি বিচারে দেশে মহিষের মাংস ও দুধ, গরুর মাংস ও দুধের তুলনায় কাছাকাছি অবস্থান করলেও খাদ্যাভাসে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। খাদ্যাভাসের বিচারে মহিষের মাংসের অবস্থান তৃতীয় স্থানে এবং মহিষের দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ পালন

এক সময় দেশব্যাপী মহিষের বিচরণ থাকলেও চারণভূমির অভাবে এই অঞ্চলগুলোতে মহিষের বিচরণ কমেছে, অন্যদিকে উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা ও দেশের বিভিন্ন হাওরাঞ্চলে চারণভূমির আধিক্যসহ অন্যান্য তুলনামূলক সুবিধা থাকায় এসব অঞ্চলে মহিষ পালন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট মহিষের শতকরা প্রায় ৪০ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে পালিত হয়। 'উন্মুক্তভাবে ছাড়া মহিষ' নামে যা সমধিক পরিচিত। শুকনো অপেক্ষা পানি ও কাদায় থাকতেই এসব মহিষ বেশী পছন্দ করে। মুক্তভাবে চলাচলের কারণে মহিষের সুস্থ থাকার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এসব চরে সনাতন পন্থায় মহিষ লালন হলেও সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতির ছোঁয়ায় মহিষের উৎপাদন বেড়েছে। বিশেষ করে চরাঞ্চলে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কারিগরী ও প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে যাওয়ার ফলে রোগ বালাইয়ের কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে মহিষ। বেড়েছে মহিষ, মহিষের মাংস ও দুধের উৎপাদন। মহিষ সমৃদ্ধ উপকূলীয় ৪টি জেলা হচ্ছে পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম। তন্মধ্যে ভোলা জেলায় মহিষ সর্বাধিক। এ জেলার সাত উপজেলায় ছোট-বড় ৭৪টি স্থায়ী চর রয়েছে। যার মধ্যে গরু ও মহিষ চরার উপযোগী চর রয়েছে ৪৫টি। এসব চরে মহিষ রয়েছে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার। জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের তথ্য মোতাবেক, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ভোলায় ১৮৪টি বড় খামারসহ পরিবারভিত্তিক খামারে প্রতিদিন দুধ উৎপাদিত হতো ৩৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন। বর্তমানে সেখানে ৭০৫টি বড় খামারসহ পরিবারভিত্তিক খামারে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৭৬ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার মেট্রিক টন মহিষের দুধ (দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০২২)। ভোলা জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী অক্টোবর, ২০২১ এ ভোলা জেলায় মোট মহিষের সংখ্যা ছিল ১.২৪,০০০। তন্মধ্যে, সর্বাধিক মহিষ ছিল চরফ্যাশন উপজেলায়। উপজেলাওয়ারী মহিষের সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

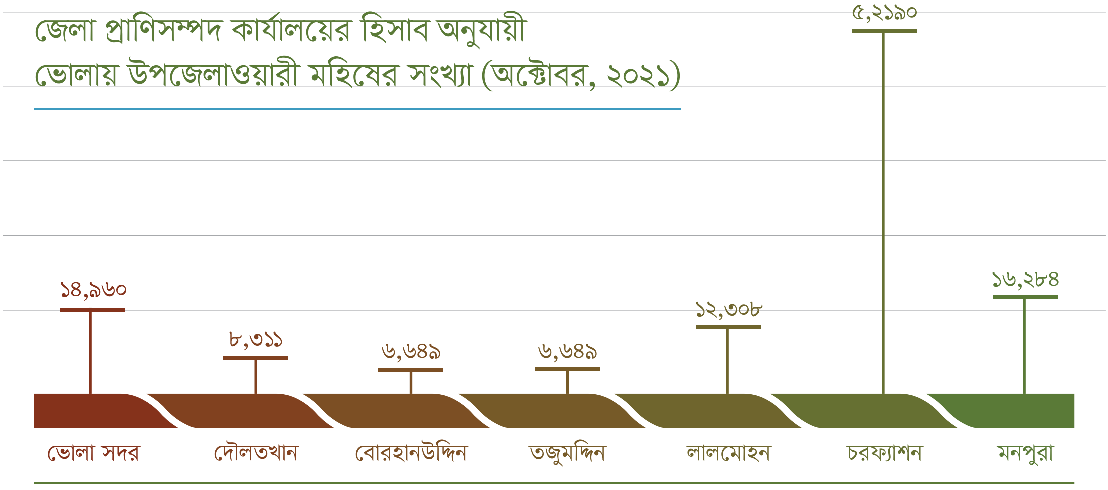

মোট - ১,২৪,০০০

মহিষ উন্নয়নে দেশে বিদ্যমান আইন-কানুন ও নীতিমালাসমূহ

মহিষ উন্নয়ন নিয়ে দেশে বিভিন্ন আইন-কানুন ও নীতিমালা রয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পলিসি-২০০৭ উল্লেখযোগ্য। এটি ২০১৭ সালে সংশোধিত হয়েছে।

- যেখানে দেশের সমতল এলাকায় নিবিড় পদ্ধতিতে যে সকল মহিষ পালিত হচ্ছে তাদেরকে দেশের বাহির থেকে ৩০০০ লিটার বা তারও বেশি দুধ দিতে পারে এমন বিশুদ্ধ মুররাহ/নিলিরাভী/মেডিটেরিয়ান জাতের সিমেন এনে তা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আপ-গ্রেডেশন করে জাত উন্নয়ন,

- যে সকল মহিষ আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে পালিত হচ্ছে তাদেরকে শংকর জাতের সীমেন অথবা বুল (৫০% দেশি ও ৫০% মুররাহ বা নিলিরাভী জীন) ব্যবহার করে ইন্টার-সি প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত উন্নয়ন এবং

- যে সকল মহিষ মাঠে ছেড়ে পালিত হয় তাদেরকে শংকর জাতের সীমেন অথবা বুল (৫০% দেশি ও ৫০% মুররাহ বা নিলিরাভী জীন) ব্যবহার করে ইন্টার-সি প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও দেশে জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ নামে একটি নীতিমালা রয়েছে, যেখানে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এদেশের আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের কথা বলা হয়েছে। খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য গো-চারণ ভূমি সৃজন ও সংরক্ষণ, চারণভূমির ব্যবহার, বেহাত হওয়া চারণ ভূমি উদ্ধার, নদী বা সাগর বক্ষে নতুন জেগে উঠা চর চারণ ভূমি হিসেবে চিহ্নিতকরণসহ চারণভূমি মহিষের প্রকৃত মালিকদের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই নীতিমালায় বিদেশ থেকে তরল ও গুড়ো দুধ আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে

মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী, ভ্যাকসিনেশন আমদানি, বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত শিল্প কারখানা স্থাপন, মহিষের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, বহুমুখী পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়, বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধকরণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি বিষয়সহ মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রায় সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এই নীতিমালায় মহিষসহ অন্যান্য প্রাণিদের নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবাদিপ্রাণির কল্যাণ নীতিমালায় (Animal Welfare Act) নিম্নে উল্লিখিত ৫ টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। বিষয় ৫ টি হলো-

১. প্রাণিকে তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও অপুষ্টি মুক্ত রাখা;
২. প্রাণির জন্য আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
৩. প্রাণির জন্য ব্যথা, ক্ষত ও রোগমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৪. প্রাণিকে ভীতি ও চাপমুক্ত পরিবেশে রাখা এবং
৫. প্রাণিকে স্বাভাবিক প্রাণিসুলভ আচরণের সুযোগ দেয়া।

এছাড়া দেশে প্রাণির অধিকার রক্ষার্থেও এমন একটি আইন আছে, যা প্রাণিকল্যাণ/অধিকার আইন-২০১৯ নামে পরিচিত। যেখানে প্রাণির ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা বলা আছে। অধিকার ৪ টি হলো-

১. এমন কোন কাজ করা বা করা থেকে বিরত থাকা, যার ফলে প্রাণি অসুস্থ হয়ে যায়;
২. প্রাণিকে দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম না করানো বা অপ্রয়োজনীয় কারণে প্রহার করা বা পেটানো;
৩. প্রাণিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার খেতে না দেওয়া কিংবা জোর করে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ানো এবং
৪. প্রাণিকে এমন জায়গায় রাখা যেখানে তার স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে বা বসতে বা শুয়ে থাকতে সমস্যা হয়।

এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পলিসি ও নীতিমালা ছাড়াও মহিষসহ অন্যান্য প্রাণি উন্নয়নে দেশে আরও কিছু নীতিমালা ও আইন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাণিদের জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা- ২০২১ ও পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১১, প্রাণিদের খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি নিয়ে পশুখাদ্য বিধিমালা- ২০১৩, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন- ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা- ২০২০, প্রাণিদের রোগ-ব্যাধি নিয়ে পশুরোগ বিধিমালা- ২০০৮ ও পশুরোগ আইন- ২০০৫, প্রাণিজ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন- ২০০৫ এবং প্রাণির জন্য কি ধরণের ঔষধ আমদানি হবে তা নিয়ে জাতীয় ঔষধ নীতি- ২০১৬ ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

দেশে 'আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮' নামে একটি আমদানি নীতি রয়েছে, যে নীতি অনুযায়ী দেশে শুকর ছাড়া অন্যান্য প্রাণির মাংস আমদানি করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। এই অনুমতি নিতে হলে আমদানিকারককে বেশ কিছু শর্ত মানতে হয়। যেমন-আমদানি করা মাংস যে প্রাণিরই হোক না কেন তা অবশ্যই খাওয়ার উপযোগী হতে হবে। প্যাকেটের গায়ে রপ্তানিকারকের নাম ও মেয়াদ ইত্যাদি মুদ্রিত আকারে থাকতে হবে। মাংসের সাথে বিষমুক্ত ও রোগমুক্ত সনদ থাকতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের 'বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন- ২০০৫' অনুযায়ী যদি কেউ দেশে পশু ও পশুজাত পণ্য আমদানি করতে চায় তবে তাকে পূর্বে উল্লিখিত শর্ত মেনে অন্তত ১৫দিন পূর্বে প্রাণিসম্পদ দপ্তরে আবেদন করতে হয়। সব বিষয় বিবেচনা করে প্রাণিসম্পদ দপ্তর এ অনুমোদন দিয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমোদন পেলে আমদানিকারক এসব পন্য আমদানি করতে পারবে। তবে মাংস আমদানির পুরো ব্যাপারটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তদারকি করে থাকে বলে জানা যায়। এখানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার নেই। কথিত আছে, ভারতের সাথে বাণিজ্য চুক্তি SAFTA'র কারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মাংস আমদানি নিষিদ্ধ করতে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না। ধারণা করা যায়, এসব কারণেই দেশে বিদ্যমান বেশ কিছু আইন থাকা সত্ত্বেও আমদানিকারকরা আইনের তোয়াক্কা না করেই বেআইনিভাবে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য বিশেষ করে গুড়ো দুধ আমদানি করছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

সরকারি উদ্যোগ

সরকারিভাবে দেশ ভাগের পূর্বে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান থেকে নিলিরাভী নামক ভালো জাতের কিছু ষাঁড় মহিষ এনে দেশি জাতের মহিষের সাথে ক্রস করানোর মাধ্যমে দেশে প্রথম মহিষের জাত উন্নয়নের সূচনা হয়। এরপর দেশে অধিক সংখ্যক একই জাতের প্রজননক্ষম ষাঁড় তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে বাগেরহাটে সরকারি প্রজনন খামার স্থাপন করা হয়, যার কর্মকান্ড সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত দেশের একমাত্র মহিষের প্রজনন খামার হিসাবে এখনও চলমান রয়েছে। ২০১০ সালের পর সরকারিভাবে মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প-১ (কম্পোনেন্ট 'এ' ও 'বি') এর আওতায় মহিষের জাত উন্নয়নে প্রজননক্ষম ষাঁড় মহিষ উৎপাদনের পাশাপাশি মহিষের সীমেন উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষামূলকভাবে এই সীমেন দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) যৌথভাবে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড চলমান রাখে।

সরকারিভাবে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একই কর্মকান্ড বৃহৎ আকারে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প -২ নামে ৫ বছর মেয়াদি আরও একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, যা ২০১৮ সাল থেকে ৮ টি বিভাগের ৪৯ টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় 'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)' চলমান রয়েছে। দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মহিষের জাত উন্নয়ন এবং মহিষের সংখ্যা বাড়ানো, দুগ্ধ উৎপাদনে মহিষের ভূমিকা জোরদারকরণ, মহিষ খামারিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং মহিষজাত খাদ্যপণ্য গ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ছয় হাজার মহিষ পালনকারী খামারি এবং ৩৬০

জন কৃত্রিম প্রজননকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মহিষের জেনেটিক উন্নয়নের জন্য ক্রসব্রিডিং, সিলেকটিভ ব্রিডিং এবং ইন্টার সি মেটিং প্রতিস্থাপন বিষয়ক গবেষণা করা হবে। এলক্ষ্যে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের মহিষ কেনা হবে ১৬টি। স্থানীয় উৎস থেকে কেনা হবে ২০০টি মহিষ। এরপর এই মহিষগুলোর মধ্যে ক্রস করিয়ে উৎপাদিত শংকর জাতের মহিষের এফ-১ প্রজন্মের বাচ্চার উৎপাদনশীলতা যাচাই এবং এফ-২ প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন, দেশি আবহাওয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ মুররাহ জাতের মহিষের সিলেকটিভ ব্রিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং জি-১ প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন করা হবে। এছাড়া সিলেট অঞ্চলের সোয়াম্প মহিষের হৃষ্টপুষ্টকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নত প্রযুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন কৌশল ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে যদি জাত উন্নয়ন সম্ভব হয়, তবে বাংলাদেশেও মহিষ পালন বেশ লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ভোলার ১৯টি চরে লবণাক্ত পানি থেকে মহিষ সুরক্ষায় ২০টি গভীর নলকূপ ও ২০টি পানির হাউজ স্থাপনের কাজ চলছে। মহিষের সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে ভোলা সদরে ১০টি ও চরফ্যাসন উপজেলার ৯টি চরে এসব নির্মাণ হচ্ছে। যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত হলে মহিষের রোগ ও মৃত্যু হার কমে আসবে। পাশাপাশি বাড়বে দুধের উৎপাদন।

বর্ণিত দুটি প্রকল্প ছাড়াও প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক একটি সরকারি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি গো-মহিষ উভয়ের জন্যই উপযোগী হবে। খামারি পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে গবাদি প্রাণির পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো হবে এর মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন ও দুর্যোগকালীন গো-খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সাইলেজ প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। খামারিদের প্রাণিপুষ্টি সংক্রান্ত আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য ১৭ হাজার ৯৪০ টি খামারে লাগসই প্রযুক্তি (সাইলেজসহ) হস্তান্তর করা হবে। অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ ঘাসের বীজ বিতরণ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স খাদ্য এবং কৃমিনাশক বিতরণ, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট নির্বাচন, জনসচেতনতা বাড়ানো এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মতো কার্যক্রমও রয়েছে প্রকল্পের আওতায়।

পিকেএসএফ -এর উদ্যোগ

মহিষের উন্নয়নে সর্বপ্রথম বৃহৎভাবে ভ্যালু চেইন কর্মকান্ড শুরু করে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। দেশের শীর্ষস্থানীয় এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সাল থেকে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রায় সবগুলো উপকূলীয় জেলা পুটয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে মহিষের উন্নয়নে স্থানীয় ৩টি এনজিও (জিজেইউএস, দ্বীপ উন্নয়ন ও এসডিআই) এর মাধ্যমে প্রায় ১৮,০০০ মহিষ খামারিদের নিয়ে ভ্যালু চেইন কর্মকান্ড শুরু করে। এসকল কর্মকান্ডের মধ্যে মহিষের আন্তঃপ্রজনন রোধে বিভিন্ন চরাঞ্চলে অর্ধশতাধিক মুররাহ জাতের প্রজননক্ষম ষাড় মহিষ বিতরণ, বিভিন্ন সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, ফ্যাটেনিং কার্যক্রম প্রচলন, পারিবারিকভাবে দুধালো মহিষ পালনের প্রচলন, উন্নতজাতের কাঁচাঘাসের চাষ সম্প্রসারণ এবং আধুনিক কিল্লা স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মহিষ রক্ষণাবেক্ষণের মতো কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে।

প্রকল্পের আওতায় দেশী জাতের মহিষের জাত উন্নয়নে উন্নত মুররাহ জাতের ব্রিডিং বুল সম্প্রসারণ করায় স্থানীয় খামারিদের মাঝে প্রজননের জন্য এই বুলের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে, যা দেশে এই ধরনের বুলের প্রাপ্যতা না থাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়ভাবে এই চাহিদা পুরণের জন্য পিকেএসএফ এর Sustainable Enterprise Project (SEP) এর অর্থায়নে স্থানীয় এনজিও জিজেইউএস এর মাধ্যমে ভোলা সদর উপজেলায় একটি ব্রিডিং ফার্ম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হলে এটি হবে মহিষ উন্নয়নে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মহিষের ব্রিডিং ফার্ম। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় ভোলাতে ২ টি উন্নতমানের কংক্রিটের কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রকল্প এলাকায় বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের সময় হাজার হাজার মহিষের আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। একই সাথে মহিষের দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের সনদায়ন ও ব্র্যান্ডিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নাম	উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ
PACE প্রকল্প	» মুররাহ জাতের প্রজননক্ষম ষাড় বিতরণ » মুররাহ জাতের মহিষের সীমেন সম্প্রসারণ » মহিষের জন্য আধুনিক মাটির কিল্লা স্থাপন » মহিষ খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ » গণভ্যাকসিনেশন ও কৃমিনাশক ক্যাম্পিং » মহিষ ফ্যাটেনিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ
SEP প্রকল্প	» মহিষের ব্রিডিং ফার্ম স্থাপন » আধুনিক কংক্রিটের কিল্লা স্থাপন

প্রকল্পের নাম	উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ
RMTP (গৃহিতব্য কর্মকান্ড)	» মিনি দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপন » মিনি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপন » দুগ্ধ ও মাংসজাত পণ্যের মোড়কীকরণ, সনদায়ন এবং ব্র্যান্ডিং » GGAP বিষয়ে বড় খামারিদের প্রশিক্ষণ » HACCP বিষয়ে প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ » উন্নতজাতের ঘাস, রেডি ফিড ও সাইলেজের সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণ » ভ্যাকসিন হাব স্থাপনের মাধ্যমে ভেকসিনের সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণ

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Ptoject (RMTP) এর আওতায় ভোলা, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে স্থানীয় জিজেইউএস ও এফডিএ নামক দুটি এনজিওর মাধ্যমে আরও একটি সমজাতীয় প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প হতে এ অঞ্চলের গবাদিপ্রাণি পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫০,০০০ সদস্যকে উত্তম প্রাণিপালন ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্থান্তর, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বিভিন্ন উপকরণ, প্রযুক্তি ও সেবাদানের সাথে যুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্তকরণের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মিট ও মিল্ক প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে খামারের উৎপাদিত দুধ ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন, পণ্য মোড়কীকরণ, সনদায়ন ও ব্র্যান্ডিং এর মতো কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে। এই ৫০,০০০ সদস্যের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ সদস্য হবে মহিষ পালনকারী। পিকেএসএফ হতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ খাতের উন্নয়নে গৃহীত ও গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ সংযুক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগ

ভোলা জেলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে বহুকাল ধরে মহিষ পালিত হলেও প্রয়োজনীয় উপকরণ, উন্নত জাতের মহিষ, কারিগরি ও প্রযুক্তি সেবা এবং বাজারজাতকরণ সহায়তার অভাবে মহিষ পালনে বিপ্লব ঘটেনি। ২০১৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ এর PACE প্রকল্পের সহায়তায় গুণগতমানের উপকরণ ও সেবা সরবরাহ বৃদ্ধি, উন্নত জাতের মহিষ সম্প্রসারণ, উন্নত ব্যবস্থাপনা চর্চা, কারিগরি ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান মহিষ পালনের তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মহিষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার কমানোর জন্য গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ভোলা ও পটুয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় প্রায় ১০,০০০ মহিষ পালনের সাথে জড়িত ভ্যালু চেইন এক্টরদের নিয়ে 'উন্নত জাতের মহিষ পালন' শীর্ষক একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। 'মহিষের দুধ ও মাংস খান, হৃদরোগের ঝুঁকি কমান' শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে প্রকল্পটির যাত্রা। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০,০০০ জন মহিষ পালনকারী উত্তম প্রাণিপালন ব্যবস্থাপনার উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তি, গুণগতমানের উপকরণ ও সেবাদানকারীদের সাথে সংযোগ সহায়তা এবং বাজারজাতকরণ সহায়তা পেয়েছে। এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ক্রমহ্রাসমান মহিষের উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রকল্প হতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গুণগতমানের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন- উন্নত মুররাহ জাতের প্রজননক্ষম ষাঁড় মহিষ, একই জাতের মহিষের সীমেন, ভ্যাকসিন, ঔষধ, দানাদার খাদ্য, উচ্চফলনশীল নেপিয়ার ঘাস ইত্যাদি) সহজলভ্য করা হয়েছে। উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শতাধিক স্থানীয় প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এসব দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেবা (যেমন- চিকিৎসা সেবা, কৃত্রিম প্রজনন সেবা, ভ্যাকসিন সেবা, কৃমিনাশক, ঔষধ ইত্যাদি) বাণিজ্যিকভাবে খামারিদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নত প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (যেমন- প্রায় ৫০টি চরে ৪৫টির মতো উন্নত মুররাহ জাতের ব্রিডিং বুল দিয়ে প্রাকৃতিক প্রজনন সম্প্রসারণ ও

একই জাতের মহিষের সীমেন দিয়ে প্রায় চার শতাধিক মাদী মহিষকে কৃত্রিম প্রজনন করানো, শতাধিক ক্যাম্পেইনিং করে নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক খাওয়ানো, নিয়মিত দানাদার খাদ্য প্রদান, চারটি আধুনিক কিল্লা নির্মাণের মাধ্যমে বন্যার সময় মহিষকে কিল্লায় রাখা, দুধালো গাভী মহিষ, গর্ভবতী গাভী মহিষ ও বাছুরের বিশেষ যত্ন নেয়া, অসুস্থ হলে সময়মত দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি) সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি (যেমন-পাঁচ শতাধিক কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি, তিন শতাধিক পারিবারিকভাবে দুধালো মহিষ পালন, তিন

লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শতাধিক দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ সকল পণ্য উৎপাদনকারীদের পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহকারী খামারি এবং পণ্যের ক্রেতাদের (স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ক্রেতা) সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য ও মাংসল মহিষ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া খামারিসহ ভ্যালু চেইনের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনানুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্থানীয় বিভিন্ন আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা

শতাধিক মহিষ ফ্যাটেনিং, শতাধিক সাইলেজ ও ইউএমএস খাদ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি) ও উপকরণ (যেমন-চারটি আধুনিক মহিষের কিল্লা স্থাপন, পঞ্চাশের অধিক কাফ স্টাটার ফিড, নেপিয়ার ঘাস ও দানাদার খাদ্যের প্রর্দশনী ইত্যাদি) প্রর্দশনী এবং ফলাফল প্রর্দশনীর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রায় সকল খামারিদের বর্ণিত উন্নত ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি এবং উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি শিক্ষিত করা হয়েছে, যা মহিষের জাত উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। খামারিদের শিক্ষিতকরণের পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে উৎপাদিত দুধ ও মাংসল মহিষ বাজারজাতকরণের

উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখেছে।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও এই প্রকল্পের আওতায় দেশি জাতের মহিষের জাত উন্নয়নে উন্নত মুররাহ জাতের ব্রিডিং বুল সম্প্রসারণ করায় স্থানীয় খামারিদের মাঝে প্রজননের জন্য এই বুলের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে, যা দেশে এ ধরনের বুলের প্রাপ্যতা না থাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ভোলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থাপনাসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরীক্ষামূলক মাটির কিল্লা সম্প্রসারণের কারণে বিগত

২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বজ্রপাতে মহিষ মারা যাওয়া হ্রাস পায়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার মহিষপালনকারীদের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলেছে। তবে মাটির কিল্লার পাড় প্রতিবছর বন্যা ও অতিবর্ষণে ভেঙ্গে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রতিবছর এসব কিল্লা মেরামত করতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে জিজেইউএস এসইপি এর অর্থায়নে ভোলা সদরের চর চটকিমারা ও গাজীর চরে পানির লেভেল থেকে ৭ ফুট উচ্চতায় উন্নতমানের কংক্রিটের তৈরি ২টি আলাদা কিল্লা নিমার্ণ করছে। এইসব কিল্লায় বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারে না। পাশাপাশি আধুনিক এই কিল্লায় রাখালদের জন্য রয়েছে নিরাপদ বাসস্থান। এছাড়াও এসব কিল্লাতে স্থাপন করা হয়েছে সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও সৌর বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পোস্ট পিট এবং বজ্রপাতে মহিষ মারা যাওয়া রক্ষায় বজ্র নিরোধক ব্যবস্থাপনা। এ প্রকল্পের আওতায় আরও কিছু চরে এ ধরনের কিল্লা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এসকল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মহিষসহ গরুর দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের সনদায়ন ও ব্রান্ডিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

উপরোক্ত প্রকল্প ছাড়াও জিজেইউএস পিকেএসএফ এর RMTP এর আওতায় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন ভ্যালু চেইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পটি ভোলা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার মোট ৬টি উপজেলায় ২৪,০০০ গবাদিপ্রাণি পালনকারী এবং এ ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ১০০০ সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিয়ে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্প হতে সকল সদস্যকেই উত্তম প্রাণিপালন ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর, খামার যান্ত্রিকীকরণ, গোখাদ্য ও ঘাসের সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, ভ্যাকসিনের হাব তৈরি, বিভিন্ন উপকরণ, প্রযুক্তি ও সেবাদানের সাথে যুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তকরণের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মিট ও মিল্ক প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে খামারের উৎপাদিত দুধ ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় HACCP অনুসরণ করে বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন, পণ্য মোড়কীকরণ, সনদায়ন ও ব্র্যান্ডিং, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বায়ারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে। এই ২৪,০০০ প্রাণিপালনকারীদের মধ্যে প্রায় ৭,০০০ সদস্য হবে মহিষ পালনকারী। এ প্রকল্পের আওতায় মহিষের দুধ ও মাংসের যে জেনেরিক ভ্যালু চেইন ম্যাপ অনুসরণ করে কাজ করা হচ্ছে তা পাশের চিত্রে দেয়া হলো-

ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ

সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, বিভিএসহ। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা। হাট ও বাজার কমিটি। বিএসটিআই। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। শিল্প মন্ত্রনালয়। জেলা মার্কেটিং অফিস। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন। আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক

প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন উপকরণ ও সেবা	দুধ ও মাংস উৎপাদন	প্রাণিজ পণ্যসংগ্রহ ও বিক্রয়	দুধ ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ	বিতরণ/সরবরাহ	বিক্রয়
ঘাস, খড় ও দানাদার খাবার বিক্রেতা		কালেকশান পয়েন্ট	প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকারি	ব্র্যান্ড/কোম্পানি	সুপার মার্কেট
মেশিন, স্পেয়ারপার্টস সরবরাহকারি ও মেকানিক	ছোট খামার	গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারি	হিমায়িত ও শীতলীকরণ প্ল্যান্ট	কো-অপারেটিভস	খুচরা বিক্রেতা
প্রাণি বিক্রেতা/ সরবরাহকারি	মাঝারি খামার	কারখানা ও চায়ের স্টল	কসাই	পাইকারি বিক্রেতা	হোটেল, রেস্টুরেন্ট
ভেটেরিনারি ডাক্তার ও পল্লী চিকিৎসক	বড়/বাণিজ্যিক খামার /বাথান	ব্যাপারি		ডিলার	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৃত্রিম প্রজননকারি	কন্ট্রাক্ট ফার্মার/গ্রোয়ার	স্থানীয় হাট/বাজার		ই-কমার্স ও এফ-কমার্স	স্ন্যাকসের দোকান
প্রাণির বাসস্থান ও প্রাণিজাত পণ্যের মোড়ক সরবরাহকারি					ভার্চুয়াল মার্কেট

উৎপাদিত পণ্য

পাস্তরিত তরল দুধ, পণির, ঘি, দই, লাবাং, আইসক্রিম, ফ্রেস ও হিমায়িত মাংস, লাইভ এনিমেল ও ইন্ডাস্ট্রি গ্রেডের পণ্য ইত্যাদি

সাপোর্ট ফাংশন

ঔষধ, পুষ্টি, মেশিন ও কৃত্রিম প্রজনন সেবাপ্রদানকারি কোম্পানি। ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠান। এনজিও ও সরকারি দপ্তর/উন্নয়ন প্রকল্প। পরিবহন সার্ভিস। যুব উন্নয়ন: প্রশিক্ষণ। আরডিএ, বার্ড ও বিএলআরআই। ব্র্যান্ড, প্যাকেজিং এন্ড সেলস সার্ভিস প্রাভাইডার। রেডিফিড, ঘাসের বীজ, সাইলেজ বিক্রয়কারি। সনদ প্রদানকারি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের ফলাফলসমূহ

মহিষ খাতের উন্নয়নে ভোলাসহ পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিগত ৮-১০ বছরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ সব অঞ্চলে মহিষের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, মৃত্যুর হার কমেছে, আন্তঃপ্রজনন হার কমেছে, পারিবারিকভাবে দুধালো মহিষ পালন ও মহিষ ফ্যাটেনিং কার্যক্রম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যা বিভিন্ন গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাবিব ও তার দল কর্তৃক ২০২১ প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে দেখা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে ভোলা জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ণিত মহিষকেন্দ্রিক নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে মহিষের দুধ উৎপাদন ২০১৬-১৭ সময়কালের তুলনায় ২০২০-২১ সময়কালে প্রায় ৬৬.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ফলাফলটি পিকেএসএফ ও তাদের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জরিপে দেখা যায়, প্রকল্প গ্রহণের ফলে বাথানে মহিষ প্রতি দুধের উৎপাদন ৮৪.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তঃপ্রজনন কাল (Calving interval) হ্রাস পেয়েছে। গড়ে ২৪ মাস থেকে ২১ মাসে নেমে এসেছে। এছাড়া পারিবারিকভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ভোলার মূল ভূখন্ডে ফ্যাটেনিং প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভোলা ও পটুয়াখালীর শতাধিক মানুষ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পারিবারিকভাবে মহিষ মোটাতাজাকরণ করছে। জরিপে আরও দেখা গেছে পারিবারিকভাবে উন্নত খাদ্য, বাসস্থানসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১৮-৩০ মাস বয়সের ষাঁড় মহিষ মোটাতাজাকরণ করলে ৪-৫ মাসে তাদের ওজন ৩৩.৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে এই বয়সের একই লিঙ্গের বাথানের মহিষের ওজন মাত্র ১০.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা এ অঞ্চলে মহিষ পালনকারীদের মাঝে একটি ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। এতে করে গুণগতমানসম্পন্ন মাংস উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে চাহিদা পুরণের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। একই সাথে পারিবারিকভাবে দুধালো মহিষ পালনের ফলে বাথানের তুলনায় তাদের দুধ উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত মুররাহ জাতের ষাড় মহিষ দিয়ে স্থানীয় দেশি মাদী মহিষকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রজননের ফলে তাদের থেকে উৎপাদিত বাচ্চার

জন্ম ওজন বাথানে পালিত মহিষের বাচ্চার জন্ম ওজনের তুলনায় প্রায় ২২-৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গণভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম হাতে নেয়ায় বর্ণিত অঞ্চলে মহিষের মৃত্যু হার ও রোগাক্রান্তের হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও এসময়ে প্রকল্প এলাকায় দুধের মূল্য ৫৩.২২% এবং কেজি প্রতি মাংসের মূল্য ৪৪.৪৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় বাজারগুলোতে নিয়মিত বিরতিতে মহিষ জবাই হচ্ছে। সার্বিকভাবে এই এলাকার মহিষ পালনকারিদের গড় আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া খামারিদের বিভিন্ন আচরণগত যেমন- খামারিরা দেশি মহিষের পরিবর্তে মুররাহ জাতের ষাঁড় মহিষ দিয়ে প্রজনন করানো, নিজস্ব উদ্যোগে মহিষকে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন প্রদান, নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ানো, মহিষ ফ্যাটেনিং, পারিবারিক পর্যায়ে দুধালো মহিষ পালন, ইউএমএস ও সাইলেজ খাদ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মহিষ খাতে এসব পরিবর্তনের ফলে ভোলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে মহিষ পালনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাড় জিরজিরে সেই মহিষের দিন ফুরিয়েছে। কদাকার সেই মহিষের স্থান দখল করে নিয়েছে আদুরে আদুরে সব মহিষ। আশা করা যায়, এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতে মহিষের মাংসের পাশাপাশি দুধের তৈরী নিরাপদ বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণেও অনবদ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। স্টাডিতে প্রাপ্ত পিকেএসএফ এর PACE এর আওতায় বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ফলাফলসমূহ সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ফলাফলসমূহ

১	মুররাহ জাতের মহিষের সীমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধি পেয়েছে	০% থেকে ৩.২৬%
২	ক্রস মুররাহ জাতের ষাড় মহিষ দিয়ে প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি পেয়েছে	০% থেকে ৭০%
৩	নেপিয়ার, পাকচংসহ অন্যান্য উন্নতজাতের কাঁচাঘাসের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	০% থেকে ১৭.৩৬%
৪	দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে কারিগরি সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে	০% থেকে ৮৮.৬৬%
৫	মহিষ পালনে নিয়মিত ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	৩.৮৩% থেকে ৯৬.১৭%
৬	মূল ভূখন্ডে পারিবারিকভাবে মহিষ ফ্যাটেনিং প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	০% থেকে ১৩.৭৭%
৭	বাথানের তুলনায় মূল ভূখন্ডে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন বৃদ্ধি পেয়েছে	৫.২% থেকে ১৩.৬%
৮	বাথান পর্যায়ে মহিষ প্রতি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (দৈনিক উৎপাদন ১.৩২ লিটার থেকে ২.২৮ লিটারে এবং উৎপাদনকাল ১৭৫.৯ দিন থেকে ২০০.৮ দিনে উন্নীত হয়েছে)	৮৪.৪৩%
৯	পারিবারিক পর্যায়ে মহিষ প্রতি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (দৈনিক উৎপাদন ২.১৩ লিটার থেকে ৩.৮৯ লিটারে এবং উৎপাদনকাল ২০০.৭ দিন থেকে ২৪০.৫ দিনে উন্নীত হয়েছে)	১১৮.৮৪%
১০	বাথানে গড়ে মহিষের আন্ত:প্রজননকাল হ্রাস পেয়েছে (২৪ মাস থেকে ২১ মাসে)	৩ মাস
১১	পারিবারিক পর্যায়ে গড়ে মহিষের আন্ত:প্রজননকাল হ্রাস পেয়েছে (২৪ মাস থেকে ১৭ মাসে)	৭ মাস
১২	বাথান পর্যায়ে ৩বছর বয়সী মহিষের গড় ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে (২২৩.৪ কেজি থেকে ২৭৮.৫ কেজিতে)	২৪.৬৬%
১৪	বাথান পর্যায়ে ৩ বছর বয়সী মহিষের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭.১৬%
১৫	পারিবারিক পর্যায়ে ৩ বছর বয়সী মহিষের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৩.৬৩%
১৬	পারিবারিকভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনায় ৪ মাসে ফ্যাটেনিংকৃত ষাঁড় মহিষের গড় ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে	১০.৪৮%
১৭	বাথানে ৪ মাসে সাধারণভাবে পালিত ষাঁড় মহিষের গড় ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে	১০.৯২% থেকে ১.৮০%
১৮	বাথানে বড় মহিষের গড় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে (৬ মাস বয়সের উপরে)	১৮.১৩% থেকে ৪.৫%
১৯	বাথানে ছোট মহিষের গড় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে (৬ মাস বয়সের নিচে)	০% থকে ৩৩.৬১%

সনি'র কিল্লায় মহিষের বাথান অজানা উপাখ্যান

সুফলভোগী একজন উদ্যোক্তার কথা

ভোলা জেলা সদরের ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চর চটকিমারা। তুলাতুলি ঘাট থেকে স্পিডবোটে রওনা হয়ে আধ ঘন্টাখানিক গেলেই চটকিমারা চর। এই চরে রয়েছে মহিষের বাথান। বহুকাল আগ থেকেই ভোলার চরগুলোতে বাথানের দেখা মিলে। এ বাথানগুলোতে মহিষ লালন-পালন করা হয়। আর যুগ যুগ ধরে যারা এই দায়িত্ব পালন করে আসছে স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে বলা হয় বাথাইন্যা। বাঁশের বেষ্টনীর ভিতর উঁচু ঢিবিতে থাকে অনেক মহিষ শাবক। আর ওপরের বড় খুপরিতে থাকে মহিষ পালকদল। এই উঁচু ঢিবিগুলোকেই বলা হয় কেল্লা। বাঁশের কেল্লার ওপরেই মোষের ঘন দুধের চা খাওয়া, রান্না, রাত যাপন। এখানে প্রত্যেক মহিষ শাবকের আলাদা আলাদা নাম আছে। নাম ধরে ডাকলেই যারা সাড়া দেয়। অভূতপূর্ব দৃশ্য। এ এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা, আর মায়ায় জড়ানো প্রকৃতির অন্যরকম খেয়াল। যেন এক অজানা অধ্যায়। মা মহিষ বা শাবক, যা-ই হোক, পালক বা বাথাইন্যাকে মনে করে তাদের শিক্ষক। যে কোনো নির্দেশনা বা শব্দ অনুসরণ করতে ভুল করে না তারা।

জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খড়াসহ সকল প্রতিকূল পরিবেশকে মেনে নিয়েই এই বাথাইন্যাদের জীবন। মহিষ বা চরের মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বাথাইন্যাদের নয়। সে বেতনভুক কর্মচারী মাত্র। তবে কিছু ক্ষেত্রে লাভের আধা-আধি হিস্যায় মহিষ শাবকের মালিকানা বাড়তে বাড়তে বাথাইন্যারা খামারি হয়ে ওঠার দুর্লভ সুযোগ পান। বাথাইন্যা থেকে ধীরে ধীরে খামারি হয়ে ওঠা এমনি একজন হলেন 'সনি'।

২০০৯ সালেও যাঁকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ দিতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)'র দশ বার ভাবতে হয়েছে, সেই বাথাইন্যাই যখন খামারি হয়ে উঠেন, তখন তাকে ১০ লাখ টাকা ঋণ পেতেও বেগ পেতে হয়নি। বর্তমানে তিনি তাঁর খামারে নির্দিষ্ট বেতনে সাতজন কর্মচারী রেখেছেন। যারা 'রাখাল' হিসেবে পরিচিত। ৩০০ টি মহিষের মধ্যে সনির ২০০ টি, যার বাজার মূল্য প্রায় ১.৫-২ কোটি টাকা। বাকি ১০০ টি মহিষ শহরে অবস্থান করা বিভিন্ন মালিকের। সেই মহিষগুলো লালন-পালনের জন্য বিশেষ আয়ের সুযোগ পান সনি। সনি মিয়ার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার একনিষ্ঠ পরিশ্রম, নিজস্ব চেষ্টা, প্রযুক্তি ও পরামর্শ এবং আর্থিক সেবা গ্রহণের পর্যাপ্ত আগ্রহ, যা তিনি পেয়েছেন সরকারি-বেসরকারি বিশেষ করে পিকেএসএফ এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সংস্থা জিজেইউএস থেকে।

দুধ দোহনের কাজটি করেন বাথাইন্যারাই। চরে ঘাস কমার সাথে সাথে দোহিত দুধের পরিমাণও যায় কমে। পিকেএসএফ এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় জিজেইউএস'র পৃষ্ঠপোষকতায় বাথাইন্যাদের থাকার ব্যবস্থায় এসেছে গুণগত পরিবর্তন। সে ঘরের আকার-আয়তন যথেষ্ট সুপরিসর না হলেও তা যথেষ্ট মজবুত। চারণভূমি থাকার কারণে বছরের অধিকাংশ সময়ে খাবারের অসুবিধা হয় না এখানে। তবে সময় সময় নদীর গতিপথ পাল্টায়। পাল্টায় এই এলাকার মানুষের জীবনধারাও। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাসে যখন চারদিকে অথৈ পানি ছাড়া আর কিছুই থাকে না তখন শত শত মহিষ ও নিজের জীবন রক্ষা করেন এই মানুষগুলো। মহিষের সঙ্গে তুফানে নদীতে ভেসে যান মাইলের পর মাইল। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটে তখন। না খেয়েও থাকতে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। এই সনি মিয়ার মতো হাজারো সনি মিয়া উপকূলীয় অঞ্চলের বিরাণভূমিতে মহিষের দেখভাল করছেন। মহিষের পাশাপাশি যাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে পিকেএসএফ ও তার উপকূলীয় সংস্থাসমূহ।

মহিষ খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ খাতের উন্নয়নে বিগত ১০ বছরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এই খাতে পরিবর্তনের একটি ইতিবাচক কম্পন (Vibration) শুরু হয়েছে। যে কম্পনের ফলে খামারিদের ভেতর এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের আচরণে ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি গ্রহণে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে উদ্যোক্তারা প্রকল্পের আওতায় সম্প্রসারিত বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে মহিষ পালন করছে। এছাড়া উপকরণ, সেবা ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। তথাপি এখনও এ খাতের উন্নয়নে বেশ কিছু অন্তরায় রয়েছে, যা বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণায় উঠে এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়গুলো নিম্নরুপ-

মহিষের সংখ্যাগত তথ্য বিভ্রাট ও ভালো জাতের গাভীর অভাব

পিকেএসএফ কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে উঠেছে এসেছে উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ভোলা জেলাতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিগত ৭ বছরে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে মহিষের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে এবং মহিষের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পিকেএসএফ-এর জরিপে দেখা যায়, ভোলা জেলায় ২০১৬-২০১৭ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ৫৪০০ সদস্যের মোট মহিষের সংখ্যা ছিল ৫৬,০০০ হাজার (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভোলা জেলা অফিসের তথ্যানুযায়ী এ সময় ভোলা জেলাতে মোট মহিষের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০)। ২০২১-২০২২ সালে প্রকল্পভুক্ত ৫৪০০ সদস্যের মহিষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬,০০০ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভোলা জেলা অফিসের তথ্যানুযায়ী এ সময় ভোলা জেলাতে মোট মহিষের সংখ্যা ছিল ১,২৪,০০০)। পিকেএসএফ-এর এই জরিপের তথ্য এবং ভোলা জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের দেয়া তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই সময় দেশব্যাপি মহিষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি শুমারী-২০১৯ অনুসারে দেশে মহিষ রয়েছে মাত্র ৩,৭৮,৪১১। বিবিএস- ২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত দেশে মহিষের সংখ্যা ৪,৫৫,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,২২,৭৬৪ হয়েছিল, যা ২০১৯ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৮,৪১১ টিতে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর -২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী একই সালে দেশে মহিষের সংখ্যা ছিল ১৪,৯২,০০০, বাংলাদেশ

ইকোনোমিক রিভিউ (বিইআর) -২০১৯ তথ্যানুযায়ী এ সময়ে মহিষের সংখ্যা ছিল ১৪,৯২,০০০ এবং ফুড এন্ড এগ্রিক্যালচারাল অরগানাইজেশন (FAO)- ২০১৯ তথ্যানুযায়ী মহিষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪,৭১,০০০। মহিষ নিয়ে এই যে বিভিন্ন উৎসের মধ্যে তথ্যের অসামঞ্জস্যতা, যা এ খাতের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ কৃষি শুমারী -২০১৯ অনুযায়ী দেশে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মহিষের সংখ্যা কমপক্ষে ৫১% হ্রাস পেয়েছে (দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২১ মার্চ ২০২১)। এখবরে আরও বলা হয়েছে দেশে গত ১৫ বছরে দুধালো মহিষের সংখ্যা ৬০% হ্রাস পেয়েছে। যদিও বাংলাদেশ কৃষি শুমারী ২০১৯-এ মহিষের গাভী, ষাঁড়, বকনা ও বাছুরের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ নেই; তথাপি বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা করা হয় দেশে বিদ্যমান ৩,৭৮,৪১১ টিতে মহিষের মধ্যে গাভী রয়েছে ২ লক্ষের কাছাকাছি, যা মহিষ উন্নয়নের অন্তরায়। কেননা যে কোন প্রাণির জাত উন্নয়নে যেমন ভালো গুণাগুণের ষাঁড় দরকার তেমনি ভালো গুণাগুণের গাভীরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপযুক্ত জাতের অভাব

বাংলাদেশে মহিষের কোন স্বীকৃত জাত নেই। তবে দুই ধরনের মহিষ রয়েছে, যেমন-জলাভূমির মহিষ ও নদীর মহিষ। দেশের মোট মহিষের ৭৫-৮০% উপকূলীয় ও হাওড় অঞ্চলে পালন করা হয়। হাওড় অঞ্চলে মূলত সোয়াম্প টাইপের মহিষ পালন করা হয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বেশির ভাগ মহিষ দেশীয় নদীর মহিষ (River buffalo)। এসব মহিষের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এরা সাধারণত গড়ে ২৫০-৩০০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং ২৭৪ দিনে মাত্র ৩৫০ কেজি দুধ দিয়ে থাকে (ফারুক, ২০১৮)। এই সব মহিষের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ভারত-পাকিস্থানে প্রাপ্ত উন্নত জাতের মহিষের দুধ উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম। ঐ সব দেশে উন্নত জাতের মহিষের দুধ উৎপাদন গড়ে ৩০০ দিনে ১৬০০ থেকে ২৮৫০ কেজি। এছাড়া আমাদের দেশের মহিষের পুনরুৎপাদন দক্ষতাও বর্ণিত দেশের মহিষের তুলনায় অনেক কম।

দীর্ঘ জেনারেশন ইন্টারভেল

দুটি বাচ্চা জন্মের মধ্যবর্তী সময়কে জেনারেশন ইন্টারভেল (Generation interval) বলা হয়ে থাকে। মহিষের এই জেনারেশন ইন্টারভেল গরুর তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। মহিষের একটি বাচ্চা থেকে অপর একটি বাচ্চা জন্ম নিতে ৬.৫ বছর সময় লাগে অর্থাৎ মহিষ গড়ে ৬.৫ বছরে ২টি বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। যেখানে ২ টি বাচ্চা জন্ম দিতে গরুর সময় লাগে গড়ে ৫.৫ বছর। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল গড়ে ১৫ মাসে ৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। দীর্ঘ জেনারেশন ইন্টারভেল ও কম বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা- এই ২ টি বৈশিষ্ট্যের কারণে মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সময় বেশী প্রয়োজন হয়।

মহিষ পালন সিস্টেম

বাংলাদেশে নোমাডিক (Nomadic) ও ট্রান্সুমেন্ট (Transhumant) সিস্টেম-এ দুধালো মহিষ পালন হয়ে আসছে। এ ব্যবস্থাপনায় মহিষের খাদ্যের প্রধান উৎস প্রাকৃতিক চারণভূমি। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র নদীর চরের প্রাকৃতিক চারণভূমি খাদ্য শস্য, সবজি ও ফল চাষের জন্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। একইভাবে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক চারণভূমি হ্রাস পাচ্ছে। অনুরূপভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপন, বনায়নের কারণে প্রাকৃতিক চারণভূমি কমছে। এ কারণে এসব অঞ্চলে নোমাডিক ও ট্রান্সুমেন্ট সিস্টেমে মহিষ পালন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে মহিষের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

আন্তঃপ্রজনন সমস্যা

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত দেশি মহিষের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অন্য দেশের মহিষের তুলনায় অনেক কম। দেশি মহিষের এই উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ইনব্রিডিং বা আন্তঃপ্রজনন সমস্যা। নিজেদের বাথানে উৎপাদিত মহিষ দিয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে বংশধর উৎপাদনকে ইনব্রিডিং বা আন্তঃপ্রজনন বলা হয়ে থাকে। বাথান সিস্টেমে বহু মহিষ একসাথে ছেড়ে পালন করা

হয়ে থাকে। যেখানে প্রজননের জন্য একই বাথানে উৎপাদিত প্রজননক্ষম ষাঁড়ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিজেদের বাথানের একই ষাঁড় মহিষ দিয়ে পুন: পুন: প্রজননের ফলে বংশানুক্রমে উপকূলীয় মহিষের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন ঘটেছে। এই আন্তঃপ্রজননের কারণে মহিষের উৎপাদনশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। এক জরিপে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ সালের দিকে এই অঞ্চলের মহিষ প্রতি দৈনিক দুধের উৎপাদন ছিল গড়ে ১.২৫-১.৫০ লিটার এবং গড় ওজন ২৫০-২৬০ কেজি। অথচ খামারিদের নিকট থেকেই শোনা যায়, এই মহিষগুলোর দাদা বা তার দাদা মহিষগুলো আজ থেকে ২০-২৫ বছর পূর্বে দৈনিক গড়ে ৫-৬ লিটার দুধ দিত এবং তাদের গড় ওজন ছিল ৩০০-৩৫০ কেজি। এছাড়া এসব চরে মহিষ পালন ব্যবস্থাপনায় যে কাঠামো বিদ্যমান তাতে কৃত্রিম প্রজনন করা সহজ নয়।

রোগাক্রান্তের হার ও উচ্চ মৃত্যু

উপকূলীয় অঞ্চলের চরগুলোতে অধিকাংশ খামারি তাদের মহিষকে কোন প্রকার ভ্যাকসিনেশন করে না এবং কৃমিনাশক খাওয়ায় না। পাশাপাশি মহিষ অসুস্থ হলে খুব বেশি চিকিৎসা করায় না বা চিকিৎসার সুযোগ নেই। ফলে এ অঞ্চলে মহিষের মৃত্যুহার উচ্চ ও রোগাক্রান্তের হার অনেক বেশি। জরিপে দেখা যায় ২০১৫-১৬ সালের দিকে এই অঞ্চলের চরগুলোতে ৬ মাস বয়সের ওপরের মহিষের মৃত্যুর হার ছিল গড়ে ১০-১২ শতাংশ এবং ৬ মাস বয়সের নিচের মহিষের মৃত্যুর হার ছিল গড়ে ১৫-১৮ শতাংশ এবং নানান রোগে মহিষের আক্রান্তের হার ছিল প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ।

চরে ভূমির অসমবণ্টন ও ব্যবহারের জটিলতা

উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন চরাঞ্চলগুলোই হলো বাথানে মহিষ পালনের একমাত্র চারণভূমি, যেখান থেকে চরাঞ্চলে পালিত অধিকাংশ মহিষের শতভাগ খাদ্যের যোগান আসে। এই চরের মালিকানা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৫-১০ ভাগ চরের মালিকানা বন বিভাগের নিকট, ২০-৩০ ভাগ স্থানীয় জনসাধারণের নিকট, ৫০-৬০ ভাগ স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট এবং স্থানীয় ভূমি অফিসের নিকট থাকে মাত্র ১৫-২০ ভাগ। কাগজেপত্রে ভূমি অফিসের নিকট ১৫-২০ ভাগ জমির মালিকানা থাকলেও এসব জমির অধিকাংশই স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভোগ দখল করেন। বনবিভাগের জমি সাধারণত কিছু অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে স্থানীয়রা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মালিকানা অনুযায়ী এই চরগুলো স্থানীয় সাধারণ মানুষদের ভোগ দখলে থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে চরগুলো দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রথা ও গায়ের জোরে স্থায়ী প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ভোগ দখল করে আসছে এবং এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই তাদের ইচ্ছেমতো স্থানীয় মহিষের মালিকদের নিকট নির্দিষ্ট রেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ চরের জমি বছরভিত্তিক ইজারা দিয়ে থাকে। যেসকল মহিষের মালিকদের সাথে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সর্ম্পক ভালো এবং টাকা বেশি দিয়ে থাকে তারাই তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ চরের জমি মহিষের চারণভূমি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ পায়। চারণভূমি হিসাবে চরের ভূমি ব্যবহারের এই জটিলতা ও অসমবন্টন, উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ পালনের অন্যতম অন্তরায়। যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

চরে খাদ্য সংকট

উপকূলীয় অঞ্চলের চরগুলোতে সাধারণ বছরে ৭ মাস (মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) প্রচুর ঘাস থাকে এবং অবশিষ্ট ৫ মাস (অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ঘাস থাকে না। এই অবশিষ্ট ৫ মাস চরে মহিষদের জন্য প্রচন্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে খাদ্যের অভাবে মহিষের দুধ উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এ সময় অনেক মহিষের বাচ্চা খাদ্য ও দুধের অভাবে পুষ্টিহীনতায় মারা যায়। এসময় ১ দিন থেকে ৩ মাস বয়সী বাচ্চা মহিষের মৃত্যুর হার প্রায় ৩-৪ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এছাড়া এই পুষ্টিহীনতার কারণে বাচ্চার গ্রোথ কমে যায়, যা তাদের দেরীতে সেক্সুয়াল ম্যাচিউরিটিতে আসতে বাধ্য করে। একদিকে এই সময়ে চরে ঘাস থাকে না,

অন্যদিকে এসময়ে অনেক চরের জমি তরমুজ চাষের জন্য ইজারা দেয়া হয়ে থাকে। ফলে তরমুজ চাষের আওতায় আসা জমি ৩ মাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় (ডিসেম্বর-মাচ পর্যন্ত), অন্যদিকে ধানের জন্য জমিটি ব্যবহার করলে সেটিও ৩ মাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত)। এভাবে তরমুজ ও ধান চাষের জন্য চরের একটি অংশ (প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ) বছরের ৬ মাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এসময় খামারিরা চরের নির্দিষ্ট অংশগুলো মহিষ চরানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে না। ফলে এসময় চরে মহিষদের চরানোর জন্য পর্যাপ্ত চর থাকে না, যা তাদের খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করে থাকে।

বাসস্থান বা আশ্রয়স্থলের সমস্যা

মহিষের খাদ্যের একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত চরাঞ্চলের একটি বড় অংশ জোয়ার-ভাটার কারণে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পানিতে ডুবে থাকে (দৈনিক প্রায় ২.৫-৩ ঘণ্টা)। প্রতিবছর বন্যার সময় বিশেষ করে মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বন্যার প্রকোপ থাকে। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস ও উচ্চ বন্যা হয়ে থাকে। আকস্মিক উচ্চ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে মহিষ মারা যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আবাসস্থল বা আশ্রয়স্থলের (চরে মাটি উচু করে মহিষের জন্য অস্থায়ীভাবে আশ্রয়ের জায়গা করা হয়ে থাকে, যাকে স্থানীয় ভাষায় কিল্লা বলা হয়ে থাকে) প্রয়োজন হয়ে থাকে, যা বেশির ভাগ চরে নেই। এই আশ্রয়স্থল না থাকার কারণে প্রায় প্রতি বছর প্রতিটি চরে কমবেশি অনেক মহিষ বিশেষ করে বাচ্চা মহিষ পানিতে ভেসে ও ডুবে মারা যায়। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে এই মারা যাওয়া মহিষের সংখ্যা প্রায় ১-২%। এছাড়া প্রচন্ড শীতের সময় খোলা আকাশের নীচে ভেজা মাটিতে দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে নিউমোনিয়ায়ও প্রতিবছর অসংখ্য বাচ্চা মহিষ মারা যায়। পাশাপাশি এসব চরে প্রতি বছর বজ্রপাতেও অনেক মহিষ মারা যাওয়ার বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়েছে। এক জরিপে দেখা গিয়েছে ২০১৬-২০২২ সাল পর্যন্ত এক ভোলা জেলাতেই বাসস্থান বা কিল্লা না থাকার কারণে আকস্মিক উচ্চ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের পানিতে ডুবে, নিউমোনিয়ায় এবং বজ্রপাতে ৩৪ টি চরে প্রায় শতাধিক মহিষ মারা গেছে।

চরে বিভিন্ন উপকরণ ও সেবার অপ্রাপ্যতা

মহিষের চারণভূমি হিসাবে বিবেচিত উপকূলীয় অধিকাংশ চরাঞ্চল সাধারণত মূল ভূখন্ড থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। মূল ভূখন্ড থেকে চরে যাতায়াতের জন্য নৌ-পথ হচ্ছে একমাত্র পথ, যেখানে নিয়মিত যাতায়াত করতে ট্রলার অথবা স্পীডবোট ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত এসব চরে মূল ভূখন্ড থেকে নিয়মিত কোন ট্রলার যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দৈনিক ১-২বার দলবদ্ধ গোয়ালাদের ট্রলার বিভিন্ন বাথান থেকে দুধ আনতে যায়। গোয়ালাদের এসব ট্রলারে করে চরে অবস্থিত মহিষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ বিশেষ করে ঔষধ ও ভ্যাকসিন এবং মহিষ অসুস্থ হলে চিকিৎসা দেয়ার জন্য সার্ভিস প্রোভাইডাররা যাতায়াত করে থাকে। এসব চরে যেতে গড়ে ১-৩ ঘণ্টা সময় লাগে। একটি ট্রলার নিয়ে একবার যাতায়াতে গড়ে ১০০০-১৫০০ টাকা খরচ হয়ে থাকে এবং স্পীডবোটে ২০০০-২৫০০ খরচ হয়ে থাকে। তবে কোন কোন চরে যেতে ট্রলারে ২৫০০-৩০০০ টাকা এবং ৪০০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকে। ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে চরে মহিষের জন্য অত্যাবশকীয় উপকরণ ও সেবার প্রাপ্যতা অনেকটা নেই বললেই চলে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এ সব চরাঞ্চলে বর্ণিত উপকরণ ও সেবার প্রাপ্যতা ১০ ভাগের বেশি হবে না এবং কোন কোন উপকরণ ও সেবা একেবারে নেই বললেই চলে।

কারিগরি লোকবলের অভাব

মহিষের চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো মূলভূখন্ড হতে দূরে অবস্থিত। ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য, দুর্গম এবং ঝুঁকিপূর্ণ বলে মহিষের জন্য কারিগরি সেবার প্রয়োজন হলে সহসাই মূল ভূখন্ড থেকে এ কাজে জড়িত অধিকাংশ লোকবলসহ ডাক্তাররা অধিকাংশ চরে যেতে চায়না, এ সংখ্যা প্রায় শতকরা ৯০। উপরন্ত এসব অঞ্চলে প্রাণির সংখ্যার তুলনায় সরকারি-বেসরকারি কারিগরি সেবা প্রদানের সাথে জড়িত জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মহিষের মালিকগণ সময়মত মহিষের সেবা দেয়ার জন্য হাতের কাছে কারিগরি লোকবল পায় না। ফলে তাদের এ সেবাদানের জন্য বাথানে চুক্তিভিত্তিতে রাখা রাখালদের উপর নির্ভর করতে হয়। রাখালদের উপর নির্ভরশীলতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে প্রায় ৮০% মহিষের মালিক সরাসরি মহিষ পালনের সাথে জড়িত নয় এবং একজন রাখালকে একসঙ্গে অনেক মহিষ দেখভাল করতে হয়। বাথানে সাধারণত ১ জন রাখাল গড়ে ২৫-৩০ টি মহিষ দেখভাল করে থাকে। বাথানে মহিষ দেখভালের সাথে জড়িত এই সব রাখালের প্রায় শতভাগ অশিক্ষিত হয়ে থাকে এবং তাদের মহিষ পালনের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান নেই। এসব কারণে মহিষের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার অভাবে মহিষের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা

মহিষের চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো মূল ভূখন্ড হতে দূরে অবস্থিত বিশেষ করে ভোলা জেলার চরাঞ্চলগুলো। এই জেলায় কমবেশি ৭৪টি চর রয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ টি চর মহিষ পালনের উপযোগী। এসব চরের মধ্যে অনেক চরই নৌপথে মূল ভূখন্ড থেকে গড়ে ৩-৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মূল ভূখন্ড থেকে এসব চরে যাতায়াতের জন্য নৌপথ হচ্ছে একমাত্র পথ, যেখানে ট্রলার অথবা স্পীডবোটে যেতে হয়। শুস্কমৌসুমে এসব চরে যেতে গড়ে ১-২ ঘণ্টা, বর্ষা মৌসুমে ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এমনকি অনেক সময় কোন কোন চরে যেমন: সদরের মাঝেরচর, চরফ্যাশনের চরহাসিনা ও চরনিজাম, মনপুরার বদনার চর ও কলাতলীর চর, লালমোহনের চরলক্ষী ইত্যাদিতে যেতে ৩-৪ ঘণ্টার বেশিও সময় লাগে। বেশি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হলে এসব চরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সময় যাওয়াই যায় না। এছাড়া প্রায় ৯০ ভাগ চরে জনমানবের বসতি নেই। ফলে এসব চরে অধিকাংশ সময় মহিষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। একই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব চরে মহিষ এবং মহিষ থেকে উৎপাদিত দুধ বিক্রির জন্য খামারিদের অপ্রাতিষ্ঠানিক চুক্তিতে আবদ্ধ বেপারি ও গোয়ালাদের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে

খামারিদের বাজারের তুলনায় কিছুটা কম মূল্যে মহিষ ও দুধ বিক্রি করতে হয়। যেমন-বর্তমানে ভোলা মূল বাজারে দুধের মূল্য গড়ে ১২০-১৩০ টাকা, যেখানে খামারিরা চরে পায় গড়ে ৮০-৯০ টাকা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উপকূলীয় চরাঞ্চলে মহিষ পালনের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা প্রায় প্রতি বছরই এসব অঞ্চলে সংগঠিত হয়ে থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে হঠাৎ বন্যা, অতি বন্যা, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস উল্লেখযোগ্য। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর অনেক মহিষ মারা যায়। স্থানীয় খামারিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, বিগত ৫ বছরে এক ভোলা জেলাতেই বজ্রপাতে আনুমানিক ২০০-২৫০ মহিষ, অতি বন্যায় পানিতে ভেসে ৫০০-৭০০ মহিষ, হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে পানিতে ডুবে/কিল্লাতে আশ্রয় না পেয়ে ৮০০-১০০০ মহিষ এবং অনাবৃষ্টিতে মাঠে ঘাস না থাকার কারণে ৩০০-৪০০ মহিষ মারা গেছে। এছাড়া এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরে মহিষের খাদ্য সংকটের অন্যতম একটি কারণ।

সুপেয় পানির অভাব

উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ভোলা অঞ্চলের চরগুলোতে বাথানে পালিত মহিষ এবং মহিষের রাখালদের খাওয়ারযোগ্য পানির অন্যতম উৎস মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী থেকে চরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা অসংখ্য ছোট খাল। এসব খালের পানি সাধারণ মিষ্টি (সুপেয়) হয়ে থাকে কিন্তু হঠাৎ বন্যা/জলোচ্ছ্বাসে অথবা অতি বন্যায় পানির সাথে অতিরিক্ত লবন এই সব খালে ঢুকে পানি মহিষের খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া শুস্ক মৌসুমে/শীত মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মার্চ) এসব খালে পর্যাপ্ত পানি থাকে না। তখন বাথানে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। এতে করে অনেক মহিষ বিশেষ করে বাচ্চা মহিষ মারা যায়। পাশাপাশি একই কারণে বড় মহিষের উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

মহিষ মালিকদের প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা

উপকূলীয় অঞ্চলে চরের বাথানে পালিত মহিষের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ প্রকৃত মালিক এসব মহিষ পালনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নন, এদের সংখ্যা প্রায় ৮০%। তারা সাধারণ চুক্তিভিত্তিক রাখালদের মাধ্যমে মহিষ লালন-পালন করে থাকে। ফলে অধিকাংশ মালিকের বাথানে মহিষ পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বাস্তবিক ধারণা নেই । এছাড়া এ অঞ্চলে বাথানে পালিত মহিষের মালিকগণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের গরু, ছাগল, ভেড়া পালনকারীদের তুলনায় অথনৈতিকভাবে বেশ স্বাবলম্বী। জরিপে দেখা যায়, ২০-২৫ টি মহিষের একজন মালিক বছরে শুধু মহিষ বিক্রি করে গড়ে ৪-৫ লাখ টাকা, ৫০-৬০টি মহিষের একজন মালিক বছরে গড়ে ৮-১০ লাখ টাকা এবং ১০০-১৫০ টি মহিষের একজন মালিক বছরে গড়ে ১৫-২০ লাখ টাকা আয় করে থাকে। এক্ষেত্রে ২০-২৫টি মহিষের মালিককে একজন রাখালের বেতন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ছাতা বাবদ মালিককে বাৎসরিক ২,১৬,০০০-২,৫০,০০০ টাকা

ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি মালিককে কিছু ঔষধ বাবদ গড়ে ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা এবং ৩০-৩৫ একর চরের ঘাসের জমি ইজারা নেয়া বাবদ গড়ে ১,০০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এভাবে ২০-২৫ টি মহিষের মালিককে মোট বাৎসরিক প্রায় গড়ে ৩,৫০,০০০-৪,০০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এসব কারণে অধিকাংশ মহিষের মালিক প্রচলিত মহিষ পালন পদ্ধতি পরিবর্তন করে উন্নত পদ্ধতিতে পালনসহ এ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বেশ উদাসীন।

খাদ্য প্রদান অনুশীলনে সমস্যা

চরের শতভাগ বাথানে প্রায় সব মহিষই প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে। মহিষের মালিকদের সচেতনতা ও অনুশীলনের অভাবে এবং উদাসীনতার কারণে মহিষকে কোন প্রকার দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয় না। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে, কোন মহিষ থেকে কাঙ্খিত মাত্রায় দুধ ও মাংস উৎপান এবং পুনুরুৎপাদন পেতে হলে মহিষকে তার দৈহিক ১০০ কেজি ওজনের জন্য নূন্যতম ১২-১৫ কেজি আঁশজাতীয় খাদ্য (কাঁচা ঘাস) এবং ০.৭৫-১ কেজি দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হয়। চরের বাথানে পালিত মহিষের উৎপাদনশীলতা ও পুনুরুৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ মহিষকে তার দৈহিক ওজন ও উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী কাঁচা ঘাসের সাথে কোন প্রকার দানাদার খাদ্য প্রদান না করা। এছাড়া সারা বছর চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত কাঁচাঘাসের সরবরাহ থাকে না

দুগ্ধ দোহনে অক্সিটোসিন হরমোনের ব্যবহার

মহিষের ওলান থেকে দ্রুত এবং শতভাগ দুধ নামানোর জন্য চরের ৮০-৯০ ভাগ বাথানে সারাবছর অক্সিটোসিন হরমোন ব্যবহার করা হয়। মাত্র ১০-২০ ভাগ বাথানে এ হরমোন ব্যবহার করা হয় না। তবে ওলানে দুধ আসার ১-১.৫ মাস পর থেকেই বিশেষ করে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এ হরমোনের ব্যবহার বেড়ে যায়। অক্সিটোসিন হরমোন ব্যবহারের মাধ্যমে ওলান থেকে শতভাগ দুধ নামানোর ফলে বাথানে বাছুরের খাওয়ানোর

জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ থাকে না। পর্যাপ্ত দুধ না পাওয়া বাছুরের অপুষ্টির একটি অন্যতম কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু এ সময় মাঠে পর্যাপ্ত ঘাসও থাকে না। এসব কারণে এসময়ে বাথানের অধিকাংশ বাছুর মহিষ অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। এ অপুষ্টির কারণে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে, যা মহিষের হিটে আসার সময়কে দীর্ঘায়িত করে। এছাড়া অক্সিটোসিন ব্যবহারের ফলে মহিষের দুধ উৎপাদনকাল কমে যায়। সাধারণত মালিকরা গোয়ালাদের কাছ থেকে বাথানের দুধ বিক্রির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে বছরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দাদন নিয়ে থাকে। এমনিতেই বছরের বর্ণিত সময়ে দুধের সরবরাহ অন্য সময়ের চেয়ে ৩০-৪০ ভাগ কমে যায়, অন্যদিকে গোয়ালাদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণে দুধ বিক্রির চুক্তির একটি মানসিক চাপ মহিষের মালিকদের অক্সিটোসিন (স্থানীয় ভাষায় যাকে অক্সিজেন দেয়া বলে) হরমোন ব্যবহারে প্ররোচিত করে থাকে।

অপুষ্টিজনিত সমস্যা

প্রায় সব চরে অধিকাংশ মহিষ বছরের কোন কোন সময় অপুষ্টিতে ভুগে, যা তাদের উৎপাদনশীলতা ও পুনুরুৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম কারণ। এছাড়া বাথানে ৬ মাস বয়সের নীচের বয়সী বাচ্চার মৃত্যুর অন্যতম কারণ পুষ্টিহীনতা। চরগুলোতে পুষ্টিহীনতার প্রথম কারণ জন্মের পর থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ না পাওয়া, দ্বিতীয় কারণ সারা বছর চরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস না থাকায় মহিষদের চাহিদা অনুযায়ী ঘাস না পাওয়া এবং তৃতীয় কারণ প্রাকৃতিক ঘাসের উপর শতভাগ নির্ভরশীলতার কারণে মহিষকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কোন প্রকার দানাদার খাদ্য প্রদান না করা। এছাড়া চরে বহিঃপরজীবি ও অন্তঃপরজীবি এবং জোঁকের আক্রমণ মহিষের পুষ্টিহীনতার আরও একটি বড় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চরে প্রায় সব মহিষ বছরের কোন না কোন পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া সারাবছর জোঁকের আক্রমনের শিকার হয়ে থাকে এবং একটি মহিষ জোঁক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দৈনিক গড়ে ২৫-৭০ মিলি পর্যন্ত রক্ত হারিয়ে থাকে।

দাদন সমস্যা

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ পালনের ক্ষেত্রে দাদন আরও একটি অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যার কারণে মূল মার্কেট থেকে বাথানের খামারিগণ তুলনামূলক কম দাম পেয়ে থাকে। সাধারণত ভোলাতে মূল মার্কেটে ১ কেজি দুধ গড়ে ১০০-১২০ টাকা বিক্রি হয়ে থাকে কিন্তু বাথানে খামারিদের থেকে সেই দুধই গোয়ালারা গড়ে ৭০-৮০ টাকায় ক্রয় করে থাকে। সাধারণত মহিষের মালিকগণ গোয়ালাদের কাছে তার বাথানের উৎপাদিত দুধ বিক্রির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে বছরভিত্তিক একটি দুধালো মহিষের জন্য বাৎসরিক ৫০০০-৬০০০ টাকা দাদন নিয়ে থাকে। বর্তমানে ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা, বরিশালের বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলায় প্রায় ২০,৩৫০ এর অধিক দুধালো মহিষ দাদনের আওতায় রয়েছে, যেখানে এই বিপুল সংখ্যক মহিষের জন্য ১০০ এর অধিক গোয়ালার দাদন বাবদ মহিষ মালিকদের কাছে প্রায় ১৪.৫০ কোটি স্থিতি রয়েছে।

নাইট্রেট পয়জনিং

স্থানীয় মহিষ পালনকারীদের মতে ডায়রিয়ার কারণে চরের বাথানে প্রতি বছরে অনেক মহিষ মারা যায় এবং প্রায় সময় অধিকাংশ বাথানে প্রায় ৪০-৫০% মহিষ এ রোগে ভুগে থাকে। প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়ানোর পরেও ডায়রিয়া সম্পূর্ণভাবে বাথান থেকে নিরাময় হয় না। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাথানে ডায়রিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ নাইট্রেট পয়জনিং। এই নাইট্রেট পয়জনিং হওয়ার অন্যতম কারণ চরের জমিতে তরমুজ চাষ। যখন তরমুজ চাষ করা হয়, তখন দ্রুততম সময়ে তরমুজের ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে প্রচুর ইউরিয়া, টিএসপি ইত্যাদি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। ৩ মাস মেয়াদি এই তরমুজ যখন চর থেকে বিক্রির উদ্দেশ্যে তোলা হয় তখন সেইজমিতে প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার থেকে যায়। পরবর্তীতে এই জমিতে বৃষ্টির পানি/জোয়ারের পানি পড়ার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ে প্রচুর কাঁচাঘাস জন্মে। এই ঘাস খেয়ে মহিষ নাইট্রেট পয়জনিং-এ আক্রান্ত হয়ে থাকে।

দুগ্ধ বাজারজাতকরণে সমস্যা

দুর্গম, সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মূল ভুখন্ড থেকে একাকি গোয়ালাদের চরে যাওয়া অথবা চর থেকে মালিকদের পক্ষে মূল ভূখণ্ডের দুধের বাজারে অথবা দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে দুধ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে মালিকদের গোয়ালাদের উপর নির্ভর করতে হয়। সাধারণত দলগতভাবে ৪-৫ জন গোয়ালা মিলে ১টি ট্রলার নিয়ে ৫-৬ টি চরের ৮-১০ টি বাথান থেকে দৈনিক গড়ে ৪০০-৫০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করে থাকে। এসব চরে একটি ট্রলার একবার যাতায়াতে গড়ে ২০০০-৩০০০ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। ফলে দলবদ্ধ গোয়ালাদের নিকট খামারিদের অনেকটা জিম্মি হয়ে থাকতে হয়। এছাড়া এসব চরে অধিকাংশ মালিক গোয়ালাদের কাছে সারা বছর দুধ বিক্রি করবে বলে এক ধরনের মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে মহিষ প্রতি দাদন নিয়ে থাকে। গোয়ালারা সাধারণত একটি দুধালো মহিষ প্রতি বাৎসরিক গড়ে ৫-৬ হাজার টাকা দাদন দিয়ে থাকে, একজন দাদনদারকারী গোয়ালাকে মালিক/বাথান প্রতি ২০,০০০ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাদন দেয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। একদিকে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যদিকে দাদন গ্রহণ। এ দুটি কারণে চরে মালিকদের গোয়ালার কাছে সারা বছর মূল ভুখণ্ডে অবস্থিত দুধের মূল্য থেকে ২০-৩০% কম মূল্যে দুধ বিক্রি করতে হয়। চরে গোয়ালারা বাৎসরিকভাবে লিটার প্রতি দুধের মূল্য গড়ে ৭০-৮০ টাকা করে দিয়ে থাকে অথচ মূল ভুখন্ডের বাজারে লিটার প্রতি দুধের মূল্য গড়ে ১০০-১২০ টাকা হয়ে থাকে, পিক সিজনে গড়ে ১৩০-১৫০ টাকা থাকে (পিক সিজন: নভেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত) এবং অফ সিজনে গড়ে ১০০-১৩০ টাকা থাকে (অফ সিজন: এপ্রিল-অক্টোবর মাস পর্যন্ত)।

মহিষ বাজারজাতকরণে সমস্যা

উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিশেষ করে ভোলা জেলার অধিকাংশ চরে যেসব কারণে মহিষের মালিকরা দুধ বাজারে নিয়ে আসে না, ঠিক সেসব কারণেই প্রায় ৯০% মালিক তাদের মহিষকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় প্রচলিত গরু ও মহিষের হাটে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে না। ফলে মহিষ বিক্রির ক্ষেত্রেও এক শ্রেণির দালাল বা বেপারিদের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। এসব দালালরা দলগতভাবে মহিষের মালিকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে চরে ট্রলার নিয়ে গিয়ে দরদাম করে বড় লটে (একসাথে ৮-১০ টি) বাথানগুলো থেকে মহিষ ক্রয় করে থাকে। বরিশাল বিভাগের সর্ববৃহৎ মহিষের হাট পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া গো-মহিষের হাটে প্রধানত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বড় বড় বেপারিদের নিকট এসব মহিষ বিক্রি করে থাকেন। এছাড়া স্থানীয়ভাবে কিছু মহিষ মাংসের জন্য জবাই হয়, তবে তা গো-মাংসের ন্যায় নিয়মিত জবাই হয় না। এসব কারণে মহিষের মালিকগণ দুধের ন্যায় মহিষ বিক্রির ক্ষেত্রেও বাজার মূল্যের চেয়ে তুলনামূলক ১০-১৫% কম মূল্য পেয়ে থাকে। সাধারণত এসব দালালগণ মালিকদের নিকট থেকে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মহিষ গড়ে ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা করে ক্রয় করে হাটে নিয়ে গড়ে ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে মহিষ প্রতি গড়ে ১০-২০ হাজার টাকা লাভ করে থাকে।

মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার অভাব

উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ভোলাতে মহিষের দুধ এবং এ দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের (মোট উৎপাদিত দুধের ৭০ ভাগ টক দই, ২৫ ভাগ মিষ্টি জাতীয় পণ্য, এবং ৫ ভাগ ঘি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) ৯০ ভাগ স্থানীয়ভাবে কনজিউম হয় এবং অবশিষ্ট মাত্র ১০ ভাগ ভোলার বাহিরে বিক্রি হয়। উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে ভোলাতে মহিষের দুধের মোট উৎপাদন তুলনামূলক কম এবং দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রেতা/পণ্যের চাহিদা না থাকার কারণে ভোলাতে মহিষের দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাস্তুরিত প্যাকেটজাত তরল দুধ এবং অন্যান্য বৈচিত্র্যময় দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল্ক ভিটা, প্রাণ, আড়ং, ফ্রেশ এর মতো প্রাইভেট কোম্পানি এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অনুরূপভাবে মাংসের জন্য উৎপাদিত মহিষের মাত্র ১০ ভাগ স্থানীয়ভাবে জবাই হয়ে থাকে তাও আবার বিভিন্ন মৌসুমে, ৭০ ভাগ মহিষ চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ মহিষ দেশের অন্যান্য

অঞ্চলে বিদ্যমান অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে চলে যায়। দুধের মতো মাংস বিক্রির জন্যও ভোলাতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক মার্কেট/কোম্পানীর অস্তিত্ব নেই। উপকূলীয় অঞ্চলে শুধু ফ্রেশ মিট বিক্রি হয়, ফ্রোজেন মিটের কোন বাজার নেই। অথচ ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশে বতর্মানে বাৎসরিক প্রায় ১২০০ টনের মতো ফ্রোজেন বাফেলো মিট বিক্রি হচ্ছে, যা ভারত থেকে আমদানী হয়ে থাকে।

মাংসের জনপ্রিয়তার অভাব

গুণগত মানের দিক দিয়ে গরুর মাংসের তুলনায় অনেকাংশে মহিষের মাংস বেশি স্বাস্থ্যসম্মত এবং স্বাদ প্রায় একই রকম হলেও গরুর মাংসের ন্যায় দেশে মহিষের মাংস ভোক্তাদের নিকট ততোটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে যে সকল মহিষ জবাই করা হতো তার অধিকাংশ মহিষই ছিল তাদের কর্মজীবন বা উৎপাদনকাল শেষ করা বৃদ্ধ বয়সের মহিষ এবং শারীরিকভাবে হাড্ডিসার। বৃদ্ধ বয়সের হাড্ডিসার মহিষের মাংস সাধারণত শক্ত, গাঢ় কালো বর্ণের এবং মোটা আঁশযুক্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের মাংসের কোমলতা ও সরসতা অনেক কম হয় এবং মাংস থেকে এক ধরনের তীব্র গন্ধ আসতে পারে। এছাড়া এ ধরনের মাংসের ভিতরে অনেক সময় প্যারাসাইট দেখা যেতে পারে (ক্রেতার নিকট যা মাংসের পোকা নামে পরিচিত)। আঁশ মোটা ও শক্ত হওয়ার কারণে এ ধরনের মাংস খুব আঠালো হয়ে থাকে এবং চিবানো কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতেই মহিষের মাংসে চর্বির পরিমাণ কম (মাত্র ২%) থাকে। তার উপর যখন বয়স্ক ও হাড্ডিসার মহিষ জবাই করা হয়, তখন এ ধরনের মহিষ থেকে প্রাপ্ত মাংসে মার্বলিং অর্থাৎ মাংসের সাথে মিশে থাকা চর্বির পরিমাণ কম থাকে। আর এই মার্বলিং অথবা ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাটই মূলত মাংসের সরসতা এবং স্বাদের জন্য ভূমিকা রাখে। যে মাংসে যত বেশি ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাট থাকবে সে মাংস ততো বেশি নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। যেমন- গরুর মাংসে এই ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাটের পরিমাণ বেশি বলেই এ মাংসের সরসতা বেশি, নরম এবং বেশি সুস্বাদু হয়ে থাকে। গরুর ক্ষেত্রে ফ্যাটেনিং প্রযুক্তি দ্রুত ও বৃহৎ আকারে সম্প্রসারণের কারণে মোটাতাজাকরণকৃত গরু থেকে উৎপাদিত মাংসে ফ্যাট ডিপোজিশন বেশি হয়ে ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাটের পরিমান বৃদ্ধি পায়, ফলে মাংস নরম হয়, মাংসের কমলতা বৃদ্ধি পায় এবং মাংসের ফাইবার চিকন হয়। ফলে এই ধরনের মাংস সহজে চিবানো যায় এবং স্বাভাবিক স্বাদ পাওয়া যায়। মূলতঃ এসব কারণে মহিষের মাংস সম্পর্কে ভোক্তাদের এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা তৈরী হয়েছে, যা মহিষের মাংসের গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা উভয় অর্জনের প্রধান অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে।

মহিষের মাংস আমদানি

বিবিধ শর্ত থাকা সত্ত্বেও আশংকাজনক হারে বাংলাদেশে হিমায়িত মহিষের মাংস আমদানি হচ্ছে (১১ অক্টোবর ২০১৯, কালের কণ্ঠ)। আর এসব মাংসের প্রধান উৎস ভারত। এ প্রসঙ্গে ভারতের মাংস রপ্তানিকারক সমিতির প্রধান ফাওয়ান আলাভি বিবিসিকে জানিয়েছেন (২ জানুয়ারি ২০১৮) ভারত থেকে রপ্তানি করা মাংসের ১০০ ভাগই মহিষের মাংস, এক গ্রামও গরুর মাংস নয়। কারণ ভারত থেকে গরু বা গরুর মাংস রপ্তানি নিষিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান Volya। এরা বৈশ্বিক আমদানী-রপ্তানির তথ্য নিয়ে গবেষণা করে। প্রতিষ্ঠানটির ০৫ অক্টোবর, ২০২১ সালের তথ্য মোতাবেক হিমায়িত মহিষের মাংস আমদানীতে বাংলাদেশ শীর্ষে। এভাবে হিমায়িত মাংসের আমদানি অব্যাহত থাকলে খামারিরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন এবং মহিষ খাত বিপর্যস্ত হবে। সংকটে পড়বে দেশের চামড়া শিল্প ও দুগ্ধ উৎপাদন শিল্প। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের এমন মতামত সত্ত্বেও অদ্যাবধি বিদ্যমান আমদানি নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি! তাছাড়া হিমায়িত মাংস পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশে উন্নত মানের পরীক্ষাগারও নেই। ফলে অপরীক্ষিত এই মাংস ভোক্তার স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। আমাদের সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে তাই হিমায়িত মাংস আমদানী নিষিদ্ধের কোন বিকল্প নেই।

সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি

মহিষের জন্য সরকারী নীতিমালায় কিছু বৈষম্য রয়েছে যেমন-১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে বর্তমানে গরু, ছাগল, মুরগির খামারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হলেও মহিষ খামারের কোন প্রকার রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয় না, ফলে মহিষ খামারিগণ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরি কমিটি (এনআরটিসি) দেশের গরুর প্রজনন কার্যক্রম দেখাশুনা করলেও এ কমিটি মহিষের প্রজনন কার্যক্রম দেখাশুনা করে না। এ দুটি বৈষম্য মহিষ সেক্টর উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

খামারিদের অভিমত এবং এ খাত থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে মহিষ খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের র‍্যাংকিং নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো-

মহিষ খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ	র‍্যাংকিং
» চরে খাদ্য সংকট	১
» উপযুক্ত জাতের অভাব	২
» চরে ভূমির অসমবন্টন ও ব্যবহারের জটিলতা	৩
» আন্তঃপ্রজনন সমস্যা	৪
» বাসস্থান বা আশ্রয়স্থলের সমস্যা	৫
» উচ্চ মৃত্যু ও রোগাক্রান্তের হার	৬
» ভালো জাতের গাভীর অভাব	৭
» চরে বিভিন্ন উপকরণ ও সেবার অপ্রাপ্যতা	৮
» কারিগরি লোকবলের অভাব	৯
» দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা	১০
» প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১১
» দীর্ঘ জেনারেশন ইন্টারভেল	১২
» মহিষ পালন সিস্টেম	১৩
» সুপেয় পানির অভাব	১৪
» মহিষের মালিকদের প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা	১৫
» খাদ্য প্রদান অনুশীলনে সমস্যা	১৬
» দুধ দোহনে অক্সিটোসিন হরমোনের ব্যবহার	১৭
» অপুষ্টি সমস্যা	১৮
» দাদন সমস্যা	১৯
» নাইট্রেট পয়জনিং	২০
» দুধ বাজারজাতকরণে সমস্যা	২১
» মহিষ বাজারজাতকরণে সমস্যা	২২
» মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার অভাব	২৩
» মাংসের জনপ্রিয়তার অভাব	২৪
» মহিষের মাংস আমদানি	২৫
» সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি	২৬

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ

বাংলাদেশে মহিষের কোন স্বীকৃত জাত নেই, উপযুক্ত প্রজননক্ষম ষাড় ও গাভী মহিষের অভাব রয়েছে এবং মহিষের জেনারেশন ইন্টারভেল গরুর তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। এসব কারণে মহিষের জাত উন্নয়ন দ্রুত সময়ে সম্ভব নয়, এটি ধীরে ধীরে করতে হবে এবং এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের সকলকে ধৈর্য ধরে অগ্রসর হতে হবে। মহিষ খাতে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

উপযুক্ত জাতের অভাব পূরণ

বাংলাদেশে মহিষের কোন স্বীকৃত জাত নেই। এক্ষেত্রে দেশের বাহির থেকে বিশুদ্ধ জাতের মুররাহ মহিষ এনে তার মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রজনন এবং কৃত্রিম প্রজনন উভয় পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে উপযুক্ত জাত উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া মহিষ প্রজনন নীতিমালা অনুসরণ করে উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষের ব্রিডিং খামার স্থাপনের মাধ্যমে আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় পালনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রজননক্ষম ষাঁড় ও ভালো জাতের গাভী মহিষ উৎপাদন করে খামারিদের মাঝে বিতরণ করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি সমন্বয়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রজননের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মহিষ প্রজনন নীতিমালা যাতে মানা হয় সে বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ National Technical Regulatory Committee (NTRC) কঠোরভাবে মনিটরিং করবে। এছাড়া একই ব্রিডিং খামারে বিশুদ্ধ একই জাতের মহিষ থেকে সিমেন উৎপাদন করেও এ চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। জাত উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম, যা কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে। সঠিক প্রজনন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং ব্রিডিং রেকর্ড রাখতে হবে। মহিষের ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে সরকারের জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পলিসি (National Livestock Development Policy) -২০০৭ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রজনন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে-

- আবদ্ধ অবস্থায় মহিষ পালনের জন্য (Intensive system): যেখানে দেশের সমতল এলাকায় আবদ্ধ অথবা নিবিড় পদ্ধতিতে যে সকল মহিষ পালিত হচ্ছে তাদেরকে দেশের বাহির থেকে ৩০০০ লিটার বা তারও বেশি দুধ দিতে পারে এমন বিশুদ্ধ মুররাহ, নিলিরাভী অথবা মেডিটেরিয়ান জাতের মহিষের সিমেন এনে তা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আপগ্রেডেশন করে জাত উন্নয়ন করা।

- অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় মহিষ পালনের জন্য (Semi-intensive system): যে সকল মহিষ অর্ধ-আবদ্ধ অথবা আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে পালিত হচ্ছে তাদেরকে ৫০% জীনের মুররাহ অথবা নিলিরাভী জাতের মহিষের সীমেন অথবা ষাড় ব্যবহার করে ইন্টার-সি প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত উন্নয়ন করা।

- মুক্ত অবস্থায় মহিষ পালনের জন্য (Extensive system): যে সকল মহিষ মুক্ত অথবা মাঠে ছেড়ে পালিত হয় তাদেরকে ৫০% জীনের মুররাহ অথবা নিলিরাভী জাতের মহিষের সীমেন অথবা ষাড় ব্যবহার করে ইন্টার-সি প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশি মহিষের মধ্যে ৫০% জিন ফিক্স করা।

ভালো জাতের গাভীর যোগান বৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি শুমারী, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইকোনোমিক রিভিউ এবং ফুড এন্ড এগ্রিক্যালচারাল অরগানাইজেন (এফএও) নামক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মহিষের প্রকৃত সংখ্যা কত তা নিয়ে বেশ অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, যা এই খাত উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। সরকারিভাবে এ অসামঞ্জস্যতা সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মহিষের আলাদা আইডেন্টিফিকেশন নম্বর চালুর মাধ্যমে মহিষের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা করা হয় দেশে দুই লক্ষের কাছাকাছি গাভী মহিষ রয়েছে, যা মহিষ উন্নয়নের অন্তরায়, কেননা যে কোন প্রাণির জাত উন্নয়নে ভালো গুণাগুণের ষাঁড় যেমন দরকার তেমনি ভালো গুণাগুণের গাভীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে সিলেকশন প্রক্রিয়ায় ভালো দেশি গাভী নির্বাচন এবং সচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারি বিধি নিষেধের মাধ্যমে গাভী মহিষ বিক্রি বন্ধের মাধ্যমেও গাভী সংরক্ষণে উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘ জেনারেশন ইন্টারভেল হ্রাসকরণ

উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে খামারিদের অত্যন্ত সর্তকতার সাথে প্রজনন ও অন্যান্য পালন ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে অভ্যস্ত করতে হবে যাতে আন্তঃপ্রজননকাল (Calving interval) দীর্ঘ না হয় এবং কোন সার্ভিস মিস না হয়।

মহিষ পালন সিস্টেমে পরিবর্তন

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে মুক্ত বা বাথান সিস্টেমে মহিষ পালনের সাথে জড়িত খামারিদের অর্ধ-আবদ্ধ ও আবদ্ধ ব্যবস্থায় মহিষ পালনে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্তঃপ্রজনন সমস্যার সমাধান

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত দেশি মহিষের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অন্য দেশের মহিষের তুলনায় অনেক কম। দেশি মহিষের এই উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ইনব্রিডিং বা আন্তঃপ্রজনন সমস্যা। বাথান সিস্টেমে বহু মহিষ একসাথে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে পালন করা হয়ে থাকে। যেখানে প্রজননের জন্য একই বাথানে উৎপাদিত ষাঁড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিজেদের বাথানের একই ষাঁড় মহিষ দিয়ে নিজেদের

আন্তঃপ্রজনন হ্রাসকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মযজ্ঞ, যা কারও পক্ষে একা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রথমত: এই অঞ্চলের খামারিদের মাঝে আন্তঃপ্রজনন রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং নিজেদের বাথানে উৎপাদিত ষাঁড় মহিষ দিয়ে নিজেদের বাথানের মাদীকে প্রজনন করানো বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের বাহির থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উন্নতজাতের প্রজননক্ষম ষাঁড় মহিষ এনে উপকূলীয় অঞ্চলের বাথানগুলোতে বিতরণ করতে হবে এবং একই সাথে বাথানে রক্ষিত দেশি ষাঁড় মহিষ সরিয়ে ফেলতে হবে। এই কাজটি একযোগে করা হলে খুব ভালো ফল পাওয়া যেতো কিন্তু এতো সংখ্যক উন্নতজাতের প্রজননক্ষম ষাঁড় মহিষ দেশে না থাকার কারণে এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়াটি চলমান রাখতে হবে এবং সকল পর্যায় থেকে কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে। তৃতীয়তঃ পরবর্তীতে উন্নতজাতের মহিষের মাধ্যমে বাথানে দেশি মহিষকে প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত বাচ্চা থেকে বাছাই (Selection) প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে ভালো দক্ষতাসম্পন্ন ষাঁড় মহিষগুলো দূরবর্তী চরগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট বিরতিতে (৪-৫বছর পর পর) নিয়মিত স্থানান্তর ও বিনিময় (Exchange) করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

রোগাক্রান্তের হার ও উচ্চ মৃত্যু হ্রাস

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক ভ্যাকসিন হাব তৈরি, সার্ভিস প্রোভাইডার উন্নয়ন, সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভ্যাকসিন বাজারজাতকারী কোম্পানীদের লিংকেজ বৃদ্ধি, টেলিমেডিসিন সার্ভিস চালুকরণ, রাখাল ও বাথাইন্যাসহ সকল খামারিদের সচেনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

চরে ভূমির অসমবণ্টন ও ব্যবহারের জটিলতা হ্রাস

দেশে জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ নামে একটি নীতিমালা রয়েছে যেখানে মহিষের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য গো-চারণ ভূমি সৃজন ও সংরক্ষণ, চারণভূমির ব্যবহার, বেহাত হওয়া চারণ ভূমি উদ্ধার, নদী বা সাগর বক্ষে নতুন জেগে উঠা চর চারণ ভূমি হিসেবে চিহ্নিতকরণসহ চিহ্নিত চারণভূমি মহিষের প্রকৃত মালিকদের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। সরকারিভাবেই সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ইজারা সিস্টেমে মহিষ খামারিদের চরের জমি বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

চরে খাদ্য সংকট হ্রাস

শুস্ক মৌসুমে চরের লবণাক্ত মাটিতে জন্মে এমন উচ্চফলনশীল লবণ সহিষ্ণু কাঁচাঘাস সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিকভাবে সাইলেজ ঘাস উৎপাদন ও চরে সম্প্রসারণে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে এবং সরকারিভাবে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ নীতিমালায় উল্লেখিত মহিষের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য গো-চারণভূমি সৃজন ও সংরক্ষণ, চারণভূমির ব্যবহার, বেহাত হওয়া চারণ ভূমি উদ্ধার, নদী বা সাগর বক্ষে নতুন জেগে উঠা চর চারণভূমি হিসেবে চিহ্নিতকরণসহ চিহ্নিত চারণভূমি মহিষের প্রকৃত মালিকদের ব্যবহার বিষয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস করা যেতে পারে।

বাসস্থান বা আশ্রয়স্থলের সমস্যা নিরসন

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সকল চরে ভূমি থেকে প্রায় ৮-১০ ফিট উচু করে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কিল্লা স্থাপন করতে হবে।

চরে বিভিন্ন উপকরণ ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে করণীয়

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক দলগত অথবা একক জলযান ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে চরে উপকরণ ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ভ্যাকসিন হাব তৈরি, সোলার সিস্টেমে বিভিন্ন মেডিসিন ও ভ্যাকসিন সংরক্ষণ ব্যবস্থার সৃষ্টি, সার্ভিস প্রোভাইডার উন্নয়ন, কুল চেইন মেইনটেইনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন পরিবহন ব্যবস্থাপনা, টেলিমেডিসিন সার্ভিস চালুকরণ, রাখালদের প্রাণিসেবা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকান্ড গ্রহণ করতে হবে।

কারিগরি লোকবলের অভাব পূরণ

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরি, টেলিমেডিসিন সার্ভিস চালুকরণ, দলগত অথবা একক জলযান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকান্ড গ্রহণ করতে হবে।

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নীতকরণ

মহিষের চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো মূল ভূখন্ড হতে বেশ দূরে। যোগাযোগের এ সমস্যা হ্রাসে চরভিত্তিক দলগত অথবা একক দ্রুত জলযান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয়

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সকল চরে ভূমি থেকে প্রায় ৮-১০ ফিট উচু করে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থাপনাসহ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কিল্লা স্থাপন করতে হবে।

সুপেয় পানির অভাব হ্রাস

সকল চরে গভীর নলকূপ বসাতে হবে, বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য চরভিত্তিক পুকুর খনন করা যেতে পারে এবং প্রধান প্রধান খাল বা ক্যানেলগুলো শুস্ক মৌসুম আসার আগে ড্রেজিং করা যেতে পারে।

মহিষ মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

চরভিত্তিক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি সকল চরে বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রর্দশনী এবং ফলাফল প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্য প্রদান অনুশীলনে পরিবর্তন

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি সকল চরে দানাদার খাদ্যের ব্যবহার নিয়ে নানান প্রর্দশনী (demonstration) এবং ফলাফল প্রর্দশনীর (Result demonstration) ব্যবস্থা করতে হবে।

দুগ্ধ দোহনে অক্সিটোসিন হরমোনের ব্যবহার হ্রাস

চরের বাথানগুলোতে অক্সিটোসিন হরমোনের ব্যবহার হ্রাসকল্পে রাখাল ও বাথাইন্যাদের মধ্যে চরভিত্তিক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে।

অপুষ্টি হ্রাসে করণীয়

মহিষের সমস্যা হ্রাসে চরভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে, চরে সারা বছর জন্মে এমন উচ্চ ফলনশীল ঘাস ও লবাণক্ত সহিষ্ণু ঘাস সম্প্রসারণ, নিয়মিত কৃমিনাশক ক্যাম্পিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে।

দাদন সমস্যা হ্রাস

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ পালনের ক্ষেত্রে দাদন একটি অন্যতম সমস্যা। এই সমস্যার কারণে মূল মার্কেট থেকে বাথানে খামারিগণ তুলনামূলক দুধের দাম কম পেয়ে থাকে। এ সমস্যা হ্রাসে বেসরকারি উদ্যোগে খামারি পর্যায়ে সহজ শর্তে ঋণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি ঋণের ব্যবহার বিষয়ে খামারিদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে।

নাইট্রেট পয়জনিং হ্রাস

স্থানীয় মহিষ পালনকারীদের মতে প্রতি বছর ডায়রিয়ার কারণে চরের বাথানে অনেক মহিষ মারা যায় এবং প্রায় সময় অধিকাংশ মহিষ এ রোগে ভুগে থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাথানে ডায়রিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ, নাইট্রেট পয়জনিং। আবার এই নাইট্রেট পয়জনিং এর অন্যতম কারণ চরের জমিতে ব্যাপকভাবে তরমুজ চাষ। এ সমস্যা হ্রাসে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে।

দুগ্ধ বাজারজাত সহজীকরণ

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চরভিত্তিক দলীয়ভাবে দুগ্ধ পরিবহনের জন্য জলযান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া কিছু কিছু চরে সোলার সিস্টেম দুগ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায় এমন সব দুধের বহুমুখি পণ্য তৈরির প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এছাড়া মূল ভূখন্ডের দুধের কারখানাগুলোতে যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমুখী পণ্য তৈরি এবং প্রচলিত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কবতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে খামারি পর্যায়ে সহজ শর্তে ঋণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মহিষ বাজারজাতকরণ

চরভিত্তিক দলীয়ভাবে মহিষ পরিবহনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে জলযান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে। আইসিটির ব্যবহারের মাধ্যমে খামারিদের বাজার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদির অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে মহিষের মাংসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার অভাব পূরণ

চরভিত্তিক উন্নতজাতের মহিষ সম্প্রসারণ, স্থানীয় মহিষের জাত উন্নয়ন ও খাদ্যের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে মহিষের দুধ থেকে তৈরি দুগ্ধজাত পণ্য ও মাংসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও মাংস বাজারজাতকারী বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সাথে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে এ সকল পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দুগ্ধ ও মাংসজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

মাংসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

মূল ভূখন্ড ও চরভিত্তিক গরুর ন্যায় মহিষ ফ্যাটেনিং প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে অল্প বয়স্ক মহিষ ফ্যাটেনিং করে তার মাংস বাজারজাত করতে হবে। মহিষের মাংস হিসাবে ব্র্যান্ডিং করে মার্কেট সেগমেন্ট নিরূপণের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের মধ্যে পছন্দানুযায়ী ফ্যাটি, নরম, মোলায়েম, সরস এবং সুস্বাদু মাংস ফ্রেশ ও ফ্রোজেন অবস্থায় সরবরাহ করতে হবে। আর যারা স্বাস্থ্য সচেতন বিশেষ করে ফ্যাটি মাংস পছন্দ করে না তাদের কাছে বাথানে পালিত মহিষের মাংস পৌঁছে দেয়ার মতো কর্মকান্ড গ্রহণ করতে হবে। বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অনলাইন মার্কেট ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে দেশব্যাপী মহিষের মাংসের বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার প্রচার-প্রসার, ক্যাম্পেইন, প্রদর্শনীর মাধ্যমে মহিষের

মাংস দিয়ে তৈরী নানান বৈচিত্র্যময় ভ্যালু এডেড পণ্য যেমন- ফ্রোজেন মিট, মিট সসেজ, মিটলফ, মিট বার্গার, মিট প্যাটিস, বাফেলো মিট গ্রীল, কর্ন বাফেলো মিট, কিউর এন্ড স্মোক বাফেলো মিট প্রোডাক্টস ইত্যাদির স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ করে এ জাতীয় পণ্যের নতুন ক্রেতা তৈরি করতে হবে। ব্যাপক প্রচার প্রসারের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে মহিষের মাংসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মহিষের মাংস আমদানি নিষিদ্ধকরণ

দেশজ মহিষ খাতের বিকাশের মাধ্যমে আমাদের সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে হিমায়িত মাংস আমদানী নিষিদ্ধের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশের মহিষ খাতের বিকাশে সরকারিভাবে দেশে মাংস আমদানি বন্ধ করতে হবে এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ

সরকারিভাবে মহিষ খামারের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এনআরটিসি-কে দেশে গরুর প্রজনন কার্যক্রম দেখাশুনার পাশাপাশি মহিষের প্রজনন কার্যক্রম দেখাশোনারও দায়িত্ব দিতে হবে। এছাড়াও জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পলিসি-২০০৭-তে উল্লেখিত উন্নত মুররাহ অথবা নিলিরাভী জাতের মহিষ দিয়ে দেশি মহিষের জাত উন্নয়ন এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ তে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এদেশের আবহাওয়ায় উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ, বিদেশ থেকে তরল ও গুঁড়া দুধ আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী, ভ্যাকসিনেশন আমদানি, বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত শিল্প কারখানা স্থাপন, মহিষের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, বহুমুখী পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়, বেসরকারি সেক্টরকে উদ্বুদ্ধকরণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি বিষয়সহ মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রায় সকল বিষয়ে যে নির্দেশনা রয়েছে, তা বাস্তবায়নে সরকারিভাবে কার্যকরি উদ্যোগ নিতে হবে।

মহিষ খাতের সম্ভাবনা

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে দুধের বাজার ২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগামী বছরগুলোতে এ বাজারের আকার ৫ শতাংশের বেশী বৃদ্ধি পাবে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশজ উৎপাদিত দুধ জাতীয় চাহিদার শতকরা ৮৩.৪৪ ভাগ সরবরাহ করছে, যেখানে মহিষ খাতের অবদান মাত্র ৩-৪%। দেশে এখনও দুধ উৎপাদনে প্রায় ১৬.৫৬% ঘাটতি রয়েছে। দুধের এই ঘাটতি পূরণে মহিষের অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ-২০২০ এর তথ্যানুযায়ী, দেশে গত ১০ বছরে গুঁড়া ও ক্রিম দুধের আমদানী ১৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে ৩৫,৮৫২ টন গুঁড়া দুধ আমদানি হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ছিল ১২২০ কোটি টাকা। ২০২০ সালে দেশে গুঁড়া দুধ আমদানী হয়েছে মোট ৯৬,০১১ টন, যার আর্থিক মূল্য ৩,২৩২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২১ সালে গুঁড়া দুধ আমদানী হয়েছে ১,০০,০০০ টন। আমদানী উর্ধ্বমুখী। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বাড়িয়ে গুঁড়া দুধের আমদানি অনেকাংশে কমানো সম্ভব । দুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে মহিষ অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে।

- OEC-২০২০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের ৭৬তম বাটার রপ্তানীকারক এবং ৯২তম আমদানীকারক দেশ। ২০২০ সালে বাংলাদেশ মোট ৫৫৫ হাজার ডলারের বাটার রপ্তানী করেছে এবং মোট ৪.৪২ মিলিয়ন ডলারের বাটার আমদানী করেছে। Tridge এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালে মোট ২০.৫৮ হাজার ডলারের ঘি রপ্তানি করেছে এবং মোট ৩.৭০ মিলিয়ন ডলারের ঘি আমদানি করেছে। মহিষের দুধে ফ্যাটের পরিমান গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুন থাকায় বাটার ও ঘি উৎপাদন এবং রপ্তানিতে মহিষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- Tridge এর রির্পোট অনুযায়ী বাংলাদেশে বাৎসরিক চিজ আমদানির পরিমান ১.২৮ মিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালে দেশে আমদানী হয়েছে ২৭৬.৭৬ হাজার মেট্রিক টন। UNCDF-এর বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুযায়ী সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে পনিরের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ এর তথ্য মতে, দেশে প্রতি বছর পনির খাওয়া হয় প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। বিগত বছরগুলোতে পনির ব্যবহারের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। পনিরের মধ্যে মোজারেলা পনির এর স্বাদ, গঠন, ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং পুষ্টিগুণের কারণে এই পনির দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্যান্ডউইচ, পিৎজা ও সালাদ জাতীয় খাদ্যে মোজারেলা পনিরের ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়া মোজারেলা পনির রপ্তানিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা প্রায় ৩০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মহিষের দুধে ফ্যাটের পরিমান গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুন হওয়ায় পনির উৎপাদনে মহিষের দুধ আলাদা একটি স্থান করে নিতে পারে।

- দেশে দুধের তৈরি প্রচলিত মিষ্টি জাতীয় পণ্যের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় দুগ্ধজাত পণ্য যেমন-পাস্তুরিত তরল দুধ, গুঁড়া দুধ, লাচ্ছি, লাবাং, মাঠা, ফ্লেভার্ড মিল্ক ইত্যাদির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সব পণ্যের চাহিদা আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বৈচিত্র্যময় দুগ্ধজাত এই পণ্যের ক্ষেত্রে মহিষের দুধের তৈরি এই পণ্য বাজারে নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে মহিষের দুধের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

- গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কোন মহিষে Beta-CasoMorphin-7 (BCM7) জীন পাওয়া যায়নি। যে পশুতে এই জীন থাকে তাদের দুধ পান করলে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গরুতে ম্যাড কাউ রোগ হয় কিন্তু মহিষে ম্যাড কাউ রোগ হয় না। সুতরাং মহিষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নিরাপদ। এছাড়া মহিষ দীর্ঘ সময় ধরে রোদে থাকার কারণে গরুর দুধের

তুলনায় মহিষের দুধে ই২ কেজিন সমৃদ্ধ প্রোটিন এবং ভিটামিন-ডি অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ই২ কেজিন সমৃদ্ধ প্রোটিন এবং ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ দুধ মানব স্বাস্থ্যের জন্য অধিক হজমযোগ্য, রোগ-প্রতিরোধক্ষম এবং মস্তিস্কের বিকাশে অধিক সহায়ক ভূমিকা রাখে। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত বিশ্বে এই দুধ অধিক দামে বিক্রি হচ্ছে এবং দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং মহিষের দুধ তুলনামূলক বেশিমূল্যে nishe market -এ বিক্রির সুযোগ রয়েছে।

ডেইরি প্রসেসিং এ বেশি পরিমাণ মহিষের দুধের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মহিষের দুধে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় দুগ্ধজাত পণ্য যথা-দই, ছানা, পনির ইত্যাদি তৈরীতে গরুর দুধের চেয়ে কম পরিমাণে লাগে এবং তা বাণিজ্যিকভাবে বেশি লাভজনক হয়।

- মহিষের দুধ ও দুধ থেকে উৎপাদিত দুগ্ধজাত পন্য তুলনামূলকভাবে গরুর দুধের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়ে থাকে। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ভোলা, পটুয়াখালীতে স্থান ও মৌসুম

- মহিষের দুধে চর্বি (গড়ে ৭%) গরুর দুধ (গড়ে ৩.৫%) অপেক্ষা বেশি থাকে বলে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য বিশেষ করে বাটার, বাটার ওয়েল, চিজ, কনডেন্স মিল্ক, আইস ক্রিম এবং বাটার মিল্ক তৈরিতে গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধের ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১ কেজি চিজ/ বাটার তৈরিতে যেখানে গরুর দুধ লাগে ৮-১০ লিটার, সেখানে মহিষের দুধ লাগে মাত্র ৫ লিটার। সুতরাং দেশের

ভেদে মহিষে দুধ লিটার প্রতি গড়ে ৮০-১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে, যেখানে গরুর দুধ ৩০-৬০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। মহিষের দুধের ঘি কেজি প্রতি গড়ে ১৬০০-২০০০ টাকায় বিক্রি হয়, যেখানে গরুর ঘি বিক্রি হয় গড়ে ৮০০-১২০০ টাকায়। কথিত আছে উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষের দুধের দধি ছাড়া কোন অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না। সুতরাং দেশে মহিষের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- FAO-২০২০ তথ্যানুসারে ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে মোট মহিষের মাংস উৎপাদিত হয়েছে ৪.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন যেখানে দেশে মাত্র ০.১৬% অর্থাৎ মহিষ থেকে এসেছে মাত্র ৬৯৬৬ মেট্রিক টন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০২১ তথ্যানুযায়ী কাগজ-কলমে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও উক্ত অর্থবছরে ১১,০০০-১২,০০০ মেট্রিক টন মহিষের মাংস ভারত থেকে আমদানী করা হয়েছে, যা ২০১৬ সালে ছিল মাত্র ২০টন (সূত্র: হালাল মিট ইম্পোর্টারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ)। এই পরিসংখ্যান মহিষের মাংসের বাজারের পরিধি বিশেষ করে ফ্রোজেন/হিমায়িত মহিষের মাংসের বাজার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

- বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মহিষের মাংস উৎপাদনকারী দেশ ভারতে ১ কেজি মহিষের মাংসের দাম ১৮০-২২০ ইন্ডিয়ান রুপি, যা বাংলাদেশী টাকায় ২০৫-২৫০ টাকা। অন্যদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মহিষ উৎপাদনকারী জেলা ভোলায় মহিষের মাংসের দাম ৫৫০-৬০০ টাকা। ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রতি কেজি মহিষের মাংসের মূল্যের পার্থক্য ২৫০-৩৫০ টাকা। এই পরিসংখ্যানে মহিষের মাংসের ব্যবসা অধিকতর লাভজনক হওয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

- বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গরুর মাংসের কেজি প্রতি গড়ে ৪.৩৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে (বাংলাদেশী টাকায় ৩৩২টাকার মতো), যেখানে দেশে তা কেজি প্রতি ৬০০-৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দেশে গরুর মাংসের দাম প্রায় দ্বিগুন। অপরদিকে মহিষের মাংস কেজি প্রতি ৫৫০-৬০০টাকা। এখানে গরুর মাংসের তুলনায় মহিষের মাংস কেজি ৫০-১০০ টাকা কম। গরুর মাংসের তুলনায় মহিষের মাংসের স্বল্প মূল্য মহিষ খাত সম্প্রসারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

- মহিষের মাংসের পুষ্টিগুণের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ভোক্তাদের মাঝে মহিষের মাংসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

- গরুর তুলনায় মহিষের কম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। একারণে মহিষ অতিরিক্ত পরিপূরক দানাদার খাদ্যের সরবরাহ ছাড়াই শুধুমাত্র ফসলের অবশিষ্টাংশ, চারণভূমির ঘাস এবং খনিজ লবণ ব্যবহার করে প্রোটিন সমৃদ্ধ চর্বিহীন মাংস এবং

ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ দুধ উৎপাদন করতে পারে। এছাড়া মহিষ অন্যান্য গবাদিপ্রাণির তুলনায় বেশি জলবায়ু সহিষ্ণু, খারাপ আবহাওয়ায় বেশি অভিযোজন ক্ষমতা রাখে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। লালন-পালনে খুব বেশি যত্ন ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না এবং তুলনামূলক বেশি দিন বাঁচে (গড়ে ১৫-১৮ বছর)। ফলে দেশের জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোতে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রাণি (Climate smart animal) হিসেবে বড় পরিসরে মহিষ সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

- রঞ্জন এবং পাঠক কর্তৃক ১৯৭৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাংস উৎপাদনকারী প্রাণি হিসেবে মহিষকে যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা ও খাওয়ানো যায় এবং ১৬-২০ মাস বয়সে জবাই করা যায় তবে তা গরুর তুলনায় অনেক কম খরচে অত্যন্ত উচ্চমানের মাংস উৎপাদন করতে পারে। একই গবেষণায় বলা হয়, মহিষকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচাঘাস ও দানাদার (৭৫:২৫) ভিত্তিক রেশন দেয়া যায় তবে দৈনিক গড়ে ৬১০ গ্রাম হারে তার দৈহিক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে (এখানে feed efficiency ৭:১)। অন্যদিকে শুধু মাত্র রাফেজ রেশন (সবুজ বারসিম/ বারসিম খড়) দিলে দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে ৩৭০ গ্রাম (এখানে feed efficiency ১০:১)। এই গবেষণায় মহিষ ফ্যাটেনিংয়ের পরিসর বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

- মহিষের ট্যালো (Tallow) হলো মহিষের চর্বির উপজাত, যা বহু শতাব্দী ধরে রান্নায় ব্যবহৃত হয়। যদিও মহিষে গরুর মাংসের চেয়ে কম চর্বি থাকে, তবুও একটি প্রাণিতে প্রায় ৫০ পাউন্ড ট্যালো থাকে। ১ আউন্স মহিষের ট্যালোতে ২৮ গ্রাম চর্বি এবং ৩০ গ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। কোন প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট নেই। উচ্চমূল্যের মহিষের এই ট্যালো একটি শক্তিশালী সুপারফুড। যা আমাদের শরীরে ভিটামিন-এ (চোখের স্বাস্থ্যের জন্য), ডি (মজবুত হাড় ও দাঁতের জন্য), ই (শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য), এবং কে (হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য) শোষণে সহায়তা করতে পারে। এই ভিটামিনগুলি আমাদের শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা থেকে শুরু করে অনাক্রম্যতা ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহে কাজ করে। মহিষের ট্যালোতে প্রচুর পরিমাণে কনজুগেটেড লিনোলিক অ্যাসিড ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, কনজুগেটেড লিনোলিক অ্যাসিড ক্যান্সার, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এটি সাহায্য করে। ঘাস খাওয়ানো মহিষে গরুর মতো শস্য খাওয়ানো প্রাণির চেয়ে ৪-৬ গুণ বেশি কনজুগেটেড লিনোলিক অ্যাসিড থাকে। এই ট্যালো বেশিরভাগ উদ্ভিজ্জ তেলের তুলনায় অনেক কম প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে যায় বলে এটি একটি বিকল্প স্বাস্থ্যকর হিসাবে তৈরি হয়। এছাড়া এই ট্যালোতে অন্যান্য রান্নার তেলের তুলনায় অনেক বেশি তাপ স্থিতিশীলতা রয়েছে, যা রান্নার সময় ফ্রি র‍্যাডিক্যাল জেনারেশনের ঝুঁকি হ্রাস করে। জলপাই বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে বাফেলো ট্যালো ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি মোমবাতি, সাবান, লুব্রিকেন্ট, শিল্প সামগ্রী, এমনকি প্রসাধনী তৈরিও ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিষের ট্যালো দিয়ে তৈরি মোমবাতিগুলির একটি ভাল ঘ্রাণ থাকে এবং তারা সাধারণ মোমবাতির চেয়ে বেশি সময় ধরে জ্বলে। মহিষের চর্বি থেকে তৈরি সাবানগুলি শক্ত হওয়ায় বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহিষের ট্যালো থেকে তৈরি প্রসাধনী সংবেদনশীল এবং শুষ্ক ত্বকের জন্য চমৎকার ময়েশ্চারাইজেশন প্রদান করে এবং ত্বক নিরাপদে রাখে। বিশ্বে প্রধান মহিষ ট্যালো সরবরাহকারী দেশ: ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, মালয়েশিয়া, ইতালি, ভিয়েতনাম, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম ইত্যাদি। ভারত প্রধান সরবরাহকারী দেশ হলেও তাদের দেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় তারা প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মহিষের ট্যালো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন-চীন, বেলজিয়াম থেকে আমদানি করে। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ভারত অপরাপর দেশ থেকে ১.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বাফেলো ট্যালো আমদানি করেছে। দেশে মহিষ খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে এই ট্যালো রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- মহিষের অফাল (offal) বলতে প্রাণি জবাইয়ের পর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত প্রাণির অন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে বুঝিয়ে থাকে। সাধারণত মহিষের হক

টেন্ডন, নেক ব্যান্ড, রেটিকুলাম, রুমেন, ওমেসাম, লেজ এবং অ্যাওর্টা, চিক, প্যাপিলি, হার্ট, ইনটেস্টাইন, লিভার, লাং, জিহব্বা ইত্যাদি অফালের অর্ন্তভূক্ত করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে কাঁচা অবস্থায় এই অফালের বেশ কদর রয়েছে এবং আবার অনেক দেশে ফ্রোজেন অফাল উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। ফ্রোজেন বাফেলো অফাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। tridge-এর তথ্যানুসারে, ভারত ২০২১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১৮ মেট্রিক টন ফ্রোজেন অফাল রপ্তানি করেছে। তাদের ফ্রোজেন অফাল বিক্রির প্রধান বাজার হচ্ছে ভিয়েতনাম, হংকং ও মিশর। বাংলাদেশও এই রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি প্যাকেটজাত করে তা দেশে বাজারজাতকরণ করতে পারে।

- এক সময় গরুর-মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি (Oasum) ও পেনিস (Pizzle) উচ্ছিষ্ট হিসেবে ফেলে দেয়া হতো। কিন্তু বহির্বিশ্বে এসব উচ্ছিষ্টের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ থেকে ৩২০ কোটি টাকা সমমূল্যের নাড়ি-ভুঁড়ি ও পেনিস বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এসব পণ্যের সিংহভাগই রপ্তানি হচ্ছে প্রধানত চীন, হংকং, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে। করোনা সংকটে অপ্রচলিত এ পণ্যের রপ্তানি অর্ধেকে নেমে এলেও টাকার অংকে তা ৩২০ কোটি টাকা ছিল। তবে করোনা সংকট না থাকলে এ রপ্তানি আয় সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা ছাড়াতো। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কোরবানির ঈদ নাড়ি-ভুঁড়ি সংগ্রহের অন্যতম সময়। আড়ৎদাররা কসাই বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রতি পিস কাঁচা লবণযুক্ত পেনিস কিনেন ৫০ থেকে ৭০ টাকা দামে। যা প্রক্রিয়াজাত শেষে প্রতি কেজি রপ্তানিকারকের কাছে বিক্রি করেন ৫৫০-৬৫০ টাকা দামে। আড়ৎদার থেকে রপ্তানিকারক পর্যায়ে প্রতি কেজি প্রক্রিয়াজাত নাড়ি-ভুঁড়ি বিক্রি হয় ৫০০-৬৫০ টাকায়। প্রক্রিয়াজাত ছাড় প্রতি কেজি কাঁচা লবণযুক্ত নাড়ি-ভুঁড়ি বিক্রি হয় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। রপ্তানির পর বিশ্ব বাজারে প্রতি টন নাড়ি-ভুঁড়ি বিক্রি হয় আট হাজার ডলারে। বিদেশে রপ্তানীসহ দেশিয় বাজারেও নাড়ি-ভুঁড়ি'র অনেক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের ১০ জনসহ সারাদেশের ৪০ জন ব্যবসায়ী গরুর নাড়ি-ভুঁড়ি ও পেনিস রপ্তানি করছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোক ঠিক করে বছর জুড়েই তারা এই সব পণ্য সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মাসে ১৪ কনটেইনার নাড়ি-ভুঁড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে এবং একেকটি কনটেইনারে ৬০ থেকে ৭০ হাজার পিস নাড়ি-ভুঁড়ি থাকে বলে জানা যায়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্র জানায়, বিশ্বে ৩২ হাজার কোটি টাকার নাড়ি-ভুঁড়ি'র বাজার রয়েছে। সুতরাং মহিষ খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারি।

- মহিষের চামড়া বইয়ের কাভার, গ্লাভস এবং হালকা ওজনের পোশাক তৈরিতে ব্যবহার হয়। মহিষের চামড়া পুরু, নমনীয় এবং অত্যন্ত শক্তিশালী বলে এটি ওজন বহনকারী বিভিন্ন পণ্য যেমন- ব্যাগের জন্য আদর্শ। এছাড়া মহিষের চামড়া গরু বা ছাগলের চামড়ার তুলনায় বেশি মোটা, অনন্য (unique) এবং ভিন্ন গ্রেইন প্যাটার্ন (grain pattern) হয়ে থাকে। ফলে এই চামড়া অত্যন্ত টেকসই হয়, দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করা যায় এবং উচ্চমুল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রফতানি পণ্যের মধ্যে এই চামড়া অন্যতম।

- মহিষের শিং থালা-বাসন, চামচ, মই, চাবুক, স্যাডল প্যাড, আঠা, খেলনা, ড্রাম, বেল্ট, স্টিরাপ, ঢাল, ছুরির কেস, নৌকা, থ্রেড ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং ঘর সজ্জার উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শিং হর্ন কিছুটা থার্মোপ্লাস্টিক বলে এই ধরনের অনেক কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

- মহিষের হাড় বোতাম, ছাতার হাতল, কর্সেট স্টে, ক্রোশেট হুক এবং এমনকি চায়না সহ অনেক ঘরোয়া জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হাড় গুঁড়া করে ফার্মা জেলটিন, ভোজ্য জেলটিন, ফটোগ্রাফিক জেলটিন ইত্যাদির কাঁচামাল হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পশু খাদ্য হিসেবেও হাড়ের ব্যবহার রয়েছে। মহিষের লোম দড়ি এবং হাল্টারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মহিষের দাঁত অলঙ্কার ও গয়না তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। লেজ ওষুধের সুইচ, সজ্জা, হুইপস, ফ্লাই ব্রাশ, গেম হুইল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয়। এছাড়া খুর এবং নখের আঠালো রাটল, চামচ, উইন্ড চাইমস, সেরিমোনি ইত্যাদি তৈরিতে মহিষের ব্যবহার রয়েছে।

- মহিষের মাংস দিয়ে তৈরী নানান বৈচিত্র্যময় ভ্যালু এডেড পণ্য যেমন- শুকনো মাংস, মাংসের আচার, মিট সসেজ, মিটলফ, মিট বার্গার, মিট প্যাটিস, বাফেলো মিট গ্রীল, কর্ণ বাফেলো মিট, কিউর এন্ড স্মোক বাফেলো মিট প্রোডাক্টস ইত্যাদি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বাজারে সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

- মহিষ থেকে বর্জ্য হিসেবে প্রাপ্ত গোবর ও মুত্রের যথেষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পূর্ণবয়স্ক মহিষ প্রতি বছর গড়ে ৪-৬ টন ভেজা গোবরসহ মুত্র উৎপাদন করে থাকে, যা জৈব সার হিসেবে দেশে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমিয়ে মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া এ গোবর দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- পারিবারিকভাবে অল্প বয়সের মহিষ ফ্যাটেনিং এর মাধ্যমে সুস্বাদু মহিষের মাংস এবং চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া মহিষের মাংস ব্র্যান্ড হিসেবে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়ার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। পাশাপাশি মহিষের হাড়, চামড়া ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বাজারে মহিষের বহুমুখী পণ্যের বাজারও তৈরি করা যেতে পারে।

- মহিষ অধ্যুষিত বেশ কিছু চরকে ঘিরে ইকোট্যুরিজমের উপযোগী স্থাপনা ও পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। যেখানে আগত দেশী-বিদেশী পর্যটকরা ভ্রমণে এসে রাখাল ও বাথাইন্যাদের সাথে থাকার সুযোগ পাবেন। কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবন ও মহিষ পালন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন। পাশাপাশি পাবেন প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য। চরকুকরী মুকরীর মতো চরগুলো ইতিমধ্যেই ভ্রমণ পিপাসুদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এরূপ একটি চরে অবস্থান করে মহিষ পালন পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে পর্যটকদের নিকট অনেক কাঙ্খিত।

পরিশেষে

চরাঞ্চলগুলোতে মহিষ পালনের ব্যাপারে সরকারকে আরও মনোযোগ বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে বহুমুখী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রাণিসম্পদ খাতটি এখানে উপেক্ষিত। পর্যাপ্ত পরিমাণে মহিষের দুধ, মাংস ও দুধের উপজাত উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের আপামর মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিঃসন্দেহে একটি উপযুক্ত বিকল্প পদ্ধতি। ভারতসহ ভূমধ্যসাগরীয় কয়েকটি দেশে উন্নত প্রযুক্তি, প্রজনন কৌশল ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিষের দুধ উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশেও সরকারি-বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকেরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

EMBASSY OF DENMARK

GJUS